চয়নিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

চয়নিকা

প্রথম সংস্করণ	...		১৩১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ	...		১৩২৪
পুনর্মুদ্রণ	...		১৩২৬
পুনর্মুদ্রণ	...	ফাল্গুন,	১৩৩০
পুনর্মুদ্রণ	...	বৈশাখ,	১৩৩১
তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ	...	ফাল্গুন,	১৩৩২
(বিশ্বভারতী) পুনর্মুদ্রণ	...	মাঘ,	১৩৩৪
" পুনর্মুদ্রণ	...	অগ্রহায়ণ,	১৩৩৬
" পুনর্মুদ্রণ	...	ভাদ্র,	১৩৩৭
" পুনর্মুদ্রণ	...	পৌষ,	১৩৩৯
" পুনর্মুদ্রণ	...	কার্তিক,	১৩৪১
" পুনর্মুদ্রণ	...	পৌষ,	১৩৪৪

মূল্য :—
কাগজের মলাট—২৸০ ; বাঁধাই—৩৷০ ও ৪৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম,
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

পূরবী [শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল]

লেখন [১৩৩৩ সাল]

মহুয়া [১৩৩৬ সাল]

বিষয় পৃষ্ঠা

খাপছাড়া [১৩৪৩ সাল]

ছড়ার ছবি [১৩৪৪ সাল]

প্রান্তিক [১৩৪৪ সাল]

চয়নিকা

চয়নিকা

মরণ

মরণরে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরন তুঝ, মেঘ জটাজূট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট ;
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।

মরণরে,
শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব্‌, নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও
মরণ তু আওরে আও।
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীঁদ ভরব সব দেহ।

তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ-তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাট-পর অবহুঁ ম ধাওব
সব-কছু টুটইব বাধা।

গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'কো পিয়া তুঁহুঁ কী ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি',
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।"

(শ্রাবণ, ১২৮৮) —ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

——

কো তুঁহুঁ

কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহুঁ রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল-যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

গোপ-বধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

তৃষিত আঁখি, তব মুখ'পর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-রতন ভরি' হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা খোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

কো তুঁহুঁ কো তুঁহুঁ সবজন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ'পর গোঁয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

(*১২৯১ ?) —ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ-প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি' কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ-মাঝারে লুটিতে চায়।

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তা'র বাঁধন কেন।
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্‌।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর।

আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিব রে পরান ঢালি'।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
মেঘ-গরজনে বরষা আসিবে,
মদির নয়নে বসন্ত হাসিবে,
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি,
মুরছি পড়িবে মলয় বায়।
দুরু দুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।
ওরে অগাধ বাসনা, অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই,

জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়,
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কী-বা চাই,
পরাণের সাধ তাই।

কী জানি কী হোলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন।
ওই-যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
কে আসিবি, কে আসিবি, তোরা কে আসিবি আয়
পাষাণ বাঁধন টুটি', ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি', ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি' দিয়া, জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।

আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে-গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কী কারাগার ঘোর,

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাতে কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

(প্র—অগ্রহায়ণ, ১২৮৯) —— —প্রভাত-সংগীত

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা সখী বসিয়া চোখোচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি,
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি'।
পুলকে পুরে প্রাণ, শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি' এসেছে চরাচর।
এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।

পরান পুরে গেল, হরষে হোলো ভোর,
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।
প্রভাত হোলো যেই, কী জানি হোলো এ কী,
আকাশ পানে চাই, কী জানি কারে দেখি।
পুরব মেঘ মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব,
মধুর আহা কী-বা মধুর মধু সব।

মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায় ;
যেদিকে আঁখি যায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।
আয় রে আয় বায়ু যা রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগৎ মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তা'রে।
আয় রে মেঘ, আয়, বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে' আমারে নিয়ে যা রে।
কনক-পাল তুলে' বাতাসে দুলে' দুলে'
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে।
আকাশ, এসো এসো, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।
প্রভাত আলো-সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।
ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে।
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি' হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখো আমার মুখপানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।

আপনি আসি' উষা শিয়রে বসি' ধীরে,
অরুণ-কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি',
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি'।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি 'পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগৎ চরাচরে।

(প্র—পৌষ, ১২৮৯) —প্রভাত সংগীত

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভালো লাগে না,
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে রবো আঁকড়িয়া,
কঠিন লৌহ-ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

জগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
বসন্তে শীতে, দিবসে নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
কঠিন কামনা চির শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে,
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।

চাও নাহি চাও, ডাকো নাই ডাকো,
কাছেতে আমার থাকো নাই থাকো,
যাব সাথে সাথে রবো পায় পায়,
রবো গায় গায় মিশি।
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
এই নৈরাশ, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্যের মতন বাজিবে
সাথে সাথে দিবানিশি॥
নিত্য কালের সঙ্গী আমি যে
আমি-যে রে তোর ছায়া,
কিবা সে-রোদনে, কিবা সে-হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কভু সম্মুখে, কভু পশ্চাতে,
আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে, একাকী যখন
বসিয়া মলিন প্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে,
চেয়ে তোর মুখ পানে।
যে-দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান,
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
যেদিকে চাহিবি, আকাশে আমার
আঁধার মুরতি আঁকা,
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা।
দুর্ভাবনার মতন নিয়ত,
তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রাত্রি এ-মুখ দেখিব
তোমার অশ্রু-নীরে।

যেন রে অকূল সাগর-মাঝারে
ডুবেছে জগৎ-তরী ;
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী,
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস ছাড়াতে ছাড়িব না তবু,
মহাসমুদ্র 'পরি।
এ অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
আমাব পরান হারায়েছে দিশা,
অনন্ত ক্ষুধা অনন্ত তৃষা
করিতেছে হাহাকার,
আজিকে যখন পেয়েছিরে তোরে,
এ চির যামিনী ছাড়িব কী ক'রে ?
এ ঘোর পিপাসা যুগ যুগ ধ'রে
মিটিবে কি কভু আর ?
জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পিছনে ভয়,
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধ'রে দিবসের পিছে
বিশ্বধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই তো নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে তৃপ্তিবিহীন
এ ক্ষুধা জাগিয়া র'বে।

(১২৯০ ?) —ছবি ও গান

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যেন গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে ব'লে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল তার পরে, হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

(১২৯১ ?) —কড়ি ও কোমল।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি',

ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
কত কে-যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরনের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।
হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—মা গো এ কেমন ধারা।
এত বাঁশি এত হাসিরাশি,
এত তোর রতনভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন।—

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি,
ভাই বোন করি' গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই।
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে
—আমি তো ওদের কেহ নই।
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন।—
আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ।
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ।
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে র'বে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে?
ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশি,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড় নিষ্ঠুর হাসি রাশি।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।

দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল কলস।

(কার্তিক ১২৯১) —কড়ি ও কোমল।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান

দিনের আলো নিবে এল সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায় এক শ মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।—

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে—
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।—

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসি মুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্ম্যি সে না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি'।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।—

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ—
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা।
শিবঠাকুরের বিয়ে হোলো কবেকার সে কথা।
সে-দিনও কি এমনিতর মেঘের ঘটাখানা।
থেকে থেকে বাজ বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা।
তিন কন্যে বিয়ে করে কী হোলো তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।"

(বৈশাখ, ১২৯২) —কড়ি ও কোমল

চির-দিন

১

কোথা রাত্রি কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা,
কে-বা আসে, কে-বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কে-বা হাসে কে-বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ কোথা গৃহ, কোথা পান্থ কোথা পথহারা।
কোথা খসে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কাল-বায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে।
এত ভাঙা, এত গড়া আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কে-বা, কোথা সিন্ধু, কোথা উর্মি, কোথা তার বেলা;-
গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ-মণ্ডপে শুধু বসে আছে এক "চির-দিন"।

২

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি
প্রলয়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন।
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,
চির-বিরহীর মতো চির রাত্রি রহিয়াছ জাগি।
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিঃশ্বাস
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে ওঠে প্রলয়-বাতাস,

জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি'।
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিকো দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর—
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর,
হাসি কাঁদি ভালবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া,
আসি থাকি চলে যাই, কত ছায়া কত উপছায়া।

৩

তাই কি। সকলি মায়া? আসে থাকে আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগযুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়ে।
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা-উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়।
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার?
যুগ-যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনে চলিয়াছি, সে কি হায় বৃথা অভিসার।
বোলো না সকলি স্বপ্ন সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন।
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার।

৪

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ,
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।

যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে এ কী পিরিতির আদান-প্রদান।
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে।
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন।
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে।

(১২৯৩?) —কড়ি ও কোমল

ভুল ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি ; নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা
অধর-কোণে,
আপনারে আর চাহে না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়ন-লোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
শরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা
জীবন-হত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কিনা,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি' আঁচর,
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর।

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি!
মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ,
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ,

সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর,
প্রেম গেছে শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।
কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।
পর-দুখ-ভার সহেনাকো আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
তবু আসি আমি, পাষাণ হৃদয়
বড় কঠোর।
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে আসে,
ঘুমে কাতর।

(বৈশাখ, ১২৯২) —মানসী।

নিষ্ফল-কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো ;
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে-অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে,
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন।

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা।
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়
যাহা পাস তাই ভালো,

হাসিটুকু, কথাটুকু
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম।
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়া পথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায়।
যে-জন আপনি ভীত, কাতর দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধা-তৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা
আপন হৃদয়-ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে।

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে-যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।

অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্ব জগতের তরে বিশ্বপতি তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি';
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে।
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

(১৩ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪) —মানসী।

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্।
কেন কাঁদি বুঝিতে পারো না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি। এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি-তুলে-চাওয়া,
ওই কথা ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া।

কেন আনো বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল।

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান।

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
শীতের পরশে মৃদু রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল,
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি'
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জানো না তাহা—আমি তাহা জানি।

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি'
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা।

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপি-চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখো না,
সব কথা শুনিতে না পাও।

কাছে আসো আশা ক'রে আছি সারাদিন ধরে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও।

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে
বসে আছি সন্ধ্যায় ক-জনা,
হয়তো বা কাছে এসো হয়তো বা দূরে বসো,
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে ;
সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি'
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণ মন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ!
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই তিন!

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ, বঁধু, ও-হাসি এতই মধু,
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা,)
প্রেম দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা।

তোমারি সে ভালবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালবাসা,
আজি এই দৃষ্টি হাসি এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে-চলে-যাওয়া, এই কাছে আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পারো না।
তর্কেতে বুঝিবে তা কি। এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

(২১শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৪) —মানসী।

পুরুষের উক্তি

যে-দিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন।

তখন উষার আধ আলো
পড়েছিল মুখে দু-জনার,
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।

আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো ব'লে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।

অনন্ত বাসর-সুখ যেন
নিত্য হাসি প্রকৃতি বধূর,
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ পাখির অশান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির-জীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে চেয়েছিনু মুখে ;
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণ-কিরীট মাথে
তরুণ দেবতা-সম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,

তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে,
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর।

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্ধ্বমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ,

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধ-চোখে দেখা
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা।

অজানিত, সকলি নূতন
অবশ চরণ টলমল,
কোথা পথ, কোথা নাই কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি, কোথা অশ্রুজল।

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাহা তুলি, খেলাই আপনা ভুলি',
কী-যে রাখি, কী-যে ফেলি, বুঝিতে পারিনে।

ক্রমে আসে আনন্দ-অলস,
কুসুমিত ছায়াতরুতলে ;
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি ব'সে ফুলদল,
ধূলি সে-ও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় এ কি সব ফাঁকি,
এই বুঝি আর কিছু নাই।
অথবা যে-রত্ন তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে বসি'
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা,
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
শরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান ধারণায়।
সেই মায়া উপবন কোথা হোলো অদর্শন
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুখাল পাথার।

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে।

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে,
কৃতার্থ হইব আশে গেলাম তোমার পাশে
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্য-সম্পদ মাঝে বসি'
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হোলো যদি কমল-আসনা।

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে,
কখনো বসন্ত-সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ-মুরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই, তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে-অভিমানে।

প্রাণ দিয়ে সেই দেবী-পূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্পঅর্ঘ্যভার।

(২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪) —মানসী।

একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

সে-দিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ-চকিতদৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে,
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি',
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা,
ঝরিত বরষাধারা
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরানে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন ;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন-শিথিল বেশ ;
সে-দিনও এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ-তিমির।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা,
সারাদিন সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।

(বৈশাখ, ১২৯৫) —মানসী।

বধূ

"বেলা-যে পড়ে এল, জলকে চল্।"—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া, সখি, কোথা সে জল,
কোথা সে বাঁধাঘাট অশথ-তল।
ছিলাম আনমনে একেলা এককোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্।"

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশ-বন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে
কোকিল ডাকে তীরে অমিয়-মাখা।
আসিতে পথে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনি ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায়ে ঘেঁসে।
বাঁধের জল-রেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া।
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া।

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে;
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, সে-ও তো মহাদোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও-যে।
স্বজন প্রতিবেশী এত-যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে।"

কেহ-বা দেখে মুখ কেহ-বা দেহ,
কেহ-বা ভালো বলে, বলে না কেহ।

ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা।
ইটের পর ইট মাঝে মানুষ কীট,
নাইকো ভালবাসা নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো।
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো।
উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি'
আর কি রূপকথা বলিবি না গো।
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি' লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে
যেন সে ভালবেসে চাহে আমারে।

নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
"বেলা-যে পড়ে এল, জলকে চল্!"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী।

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ।
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন।

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন,
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতা-ভরা
সেই সরসীর তীর, করবীর বন;

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা,
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে।

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ-বা পরিত মালা কেহ-বা ভরিত ডালা
করিত দক্ষিণ বায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়;
প্রান্তরের প্রান্ত দেশে মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকাল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি;
সুখদুঃখ ভাগ লয়ে প্রতিদিন যায় বয়ে,
গোপন স্বপন লয়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছি ছি নারীর হৃদয়,
লাজে ভয়ে থরথর ভালবাসা সকাতর,
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়।

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপাশাখে সোনা ফুল ফুটে থাকে,
সেই তারা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল,
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙিয়া দেখেনি কেহ হৃদয়-গোপনগেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি',
পল্লবের সুচিক্কণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি ধূলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথায় ব্যথী ভালবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কী বলিয়া।
ভুল ক'রে এসেছিলে? ভুলে ভালবেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল,
আমার যে ফিরিবার পথ রাখো নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ-যে প্রাণের আড়াল।

এ কী নিদারুণ ভুল। নিখিল নিলয়ে
শত শত প্রাণ ফেলে ভুল ক'রে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে।

ভেবে দেখো আনিয়াছ মোরে কোন খানে,
শত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুক-কঠিন ধরা
চেয়ে র'বে অনাবৃত কলঙ্কের পানে।

ভালবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা বেশে?

(১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী।

গুপ্ত প্রেম

তবে পরানে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে।

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কী ব'লে আপনারে দিব তায়।

ভাল বাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালবাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক্ সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে।

যার নবীন-সুকুমার কপোলতলে
রাঙিয়া উঠে প্রেম লাজে গো।
যাহার ঢলঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরে তো ঝরে যাক শুকায়ে,
হৃদয়মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

যত গোপনে ভালবাসি পরান ভরি'
পরান ভরি' উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে-শোভা কাহারে তো দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে যায়।
প্রেম-যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনের অন্ধকূপে থেকে যায়।

দেখো বনের ভালবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি-যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিছে।

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরানে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে লয়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারও মনে
প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন স্বপনের
করে সে জীবনের তমো-দূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।

অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহার চেয়ে সে যে মহীয়ান্।

পাছে কু-রূপ কভু তাঁরে দেখিতে হয়
কু-রূপ দেহ মাঝে উদিয়া,
প্রাণের এক-ধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত, নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মন-আশা দ'লে যাই,—
পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে "এ কে।"
দুহাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাবে "এ-ও কি প্রেম জানে।
আমি তো এর পানে চাহিনি।"

তবে পরানে ভালবাসা কেন গো দিলে,
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে-যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে।

(১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী

দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প-সম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালোমানুষ সেজে, বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে ক'ষে।
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব,
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোশে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হোলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি, গৃহের প্রতি টান,
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালি-সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন,—
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি' চলেছি নিশিদিন ;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।

অন্ধকারে সূর্যালোতে সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা, সঙ্গী পরানের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ, ঊর্ধ্বে নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে আম্রবন-ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকিয়ে ধরি' বাজাও ও-কী সুর।
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে বাদ্যে ভরপুর।
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে পোলিটিকাল তর্ক করে,
জানালা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা, ফুলের মালা, তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর।

কিসের এত অহংকার, দম্ভ নাহি সাজে।
বরং থাকো মৌন হয়ে সসংকোচ লাজে!
অত্যাচারে, মত্তপারা কভু কি হও আত্মহারা।
তপ্ত হয়ে রক্তধারা ফুটে কি দেহমাঝে।
অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি' বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর।

পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি'　　ঘৃণায়-মাথা অন্ন খুঁটি'
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি' ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব করো পূর্বপুরুষের,
আর্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বী থরথর।

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্টহাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না তো ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি'　　বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি'
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে শান্তি নাহি মানি।

(১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫)　　—মানসী।

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে　　বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দু-জনে মুখোমুখি　　গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার,
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখি-নীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণ বরিষনে একদা গৃহকোণে
দু-কথা যদি বলি কাছে তা'র
তাহাতে আসে যাবে কী বা কার।

আছে তো তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস।
আসিবে কত লোক কত না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগত চলে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে-কথা আজি যেন বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

(৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬) —মানসী।

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ হরণ করি'।
তোমার পাইনে কূল,
আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম ;
অগাধ অপার উদার দৃষ্টি নাহিকো তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ-পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

(২৬ শ্রাবণ, ১২৯৬) —মানসী

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীত-হার;
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দু-জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দু-জনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

(২ ভাদ্র, ১২৯৬) —মানসী।

মেঘদূত

কবিবর কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

সে-দিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের

অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সে-দিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি' মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে। বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ-পক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,— দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্তকেশে, ম্লানবেশে, সজল নয়নে?

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া।
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি' লয়ে দিশ দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হোতে দিশাহারা।
পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি' মেঘদল
স্বাধীন গগন-চারী, কাতরে নিশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন পানে; ধায় তা'রা ছুটি'
উধাও কামনা সম; শিখরেতে উঠি'

সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে, করি বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা ; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া ; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদ-মন্দ্রের ;
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিণী-সম।

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত-তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন।
সে-সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হতে।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি ব'সে আজি ; যে-শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফল-শ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়

সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি',
বলে, "মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি।"
কোথায় অবন্তীপুরী ; নির্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়-চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এই মতো মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে।
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম-সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।

মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশী-রেখা
পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায় ;—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম, ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ।
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।

(৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭) —মানসী

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হোলো সারা,
ভরা নদী ক্ষুর-ধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট খেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে-ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট খেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চ'লে যায়, কোনোদিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু-ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে।
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুসি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভ'রে।
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে,
এখন আমারে লহ করুণা ক'রে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে' ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

(ফাল্গুন, ১২৯৮) —সোনার তরী।

হিং টিং ছট্

(স্বপ্নমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা, এল এক বেদে,
"পাখি উড়ে গেছে" ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে;

সম্মুখে রাজারে দেখি' তুলি' নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্‌থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়্‌সুড়ি।
রাজা বলে "কী আপদ।" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা-দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখির মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্‌।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান্‌।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে গেছে কথা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি' উঠে—"হিং টিং ছট্‌।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল;

উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংশ।
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান;
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।
চুপ ক'রে বসে থাকে বিষম সংকট,
থেকে থেকে হেঁকে উঠে—"হিং, টি, ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র রাজ—
"ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ।
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।"—
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশকপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি' কয়—
"সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্।"
সভাসুদ্ধ বলি উঠে—"হিং টিং ছট্।"

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্ন শুনি' ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
"ডেকে এনে পরিহাস।" রেগেমেগে বলে।-
ফরাসি পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি' বুকে,—
"স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে ;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কী মিষ্ট আহা—হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক্ ধিক্—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক।
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্কবিকার,
এ কথা কেমন ক'রে করিব স্বীকার।
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্মপ্রাণ" জাতি,
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে।—দুপুরে ডাকাতি।
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
"গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক্।

হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।”
সতের মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্বার উচ্চারিল—“হিং টিং ছট্‌।”
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরু-মারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খ'সে খ'সে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, “কী লয়ে বিচার।
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার;
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।”
সমস্বরে কহে সবে—“হিং টিং ছট্‌।”
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি' মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার ;—
বহু পুরাতন ভাব নব আবিষ্কার ;—
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—"পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।"
হাঁপ ছাড়ি' উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি' চড়ি' উঠে।

ছেলেরা ধরিল খেলা বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—"হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা-কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিত্,
অনিশ্চিত এ-সংসারে এ-কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলই মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

(১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) —সোনার তরী

প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা ?
এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে ;
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি' শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান,—দূর হতে তাই শুনে'
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি' উঠে ; শুনি' সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা ;—মধুময় হয়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে-নদীটি ছুটে,
মোদের কুটীর-প্রান্তে যে-কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে ;—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি' মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি' নিজ মৌন ভালবাসা ;
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,—
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেম-জ্যোতি,
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি।

সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে

কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে,
রেখেছিল মগ্ন করি'। এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে। আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে? তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন?

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য-পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি' কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।

সে-কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। "কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে।—
সোনা-মুগ সরুচাল সুপারি ও পান;
ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারি খান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই সরিষার তেল;
আমসত্ত্ব আমচুর; সের দুই দুধ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে ক'রে।"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়,
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে; কহিলাম ধীরে
"তবে আসি।" অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহিরে দ্বারের কাছে বসি' অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের; এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে

বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি," সে কহিল বিষণ্ণনয়ন
ম্লান মুখে, "যেতে আমি দিব না তোমায়।"
যেখানে আছিল ব'সে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়।"
তবুও সময় হোলো শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হোলো।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্ধাভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধ'রে দুটি ছোট হাতে,
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি' গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ,
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে,—শুধু ব'লে রাখা, "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি।" হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব।" শুনি' তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে

দুয়ারে রহিলি ব'সে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস।
কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর,
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে
কহে, "যেতে নাহি দিব।" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তা'রেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তা'রে
কহিতেছে শতবার, "যেতে দিব না রে।"

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে;
প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হুহু ক'রে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি' বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিব না দিব না যেতে"—নাহি শুনে কেউ
নাহি কোনো সাড়া।
চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি',
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধ'রে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হোলো না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি'
"যেতে নাহি দিব।" ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।

আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর।"
এত বলি', দর্পভরে করে সে প্রচার
"যেতে নাহি দিব।"—তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে' চলে যায়
একটি নিঃশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির।—তবু প্রেম বলে,
"সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।" তাই স্ফীতবুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই।'—হেন গর্বকথা।
মৃত্যু হাসে বসি'। মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ-নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে',
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
প'ড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা, অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র ল'য়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি' অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি' দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূরে নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

(১৪ কার্তিক, ১২৯৯) —সোনার তরী।

সমুদ্রের প্রতি

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি, তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন করো আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে'

তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি', নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলে যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড়ো বুকে,
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে স্নেহ-গর্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথা রে,
কোথা তার তল, কোথা কূল। বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগম্ভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি!—কখনো বা আপনারে
রাখিতে পারো না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধরো চাপি'
নির্দয় আবেগে; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি',
রুদ্ধশ্বাসে উর্ধ্বশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি',
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তা'রে বাঁধি',
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তা'রে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধী প্রায়
পড়ে থাকো তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল; ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে; সন্ধ্যাসখী ভালবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে

চলে যায় তিমির-মন্দিরে ; রাত্রি শোনে বক্ষরূপে
গুমরি'-ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে' ফুলে'।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে-রক্ত বহে সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে-
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গনি'—
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি' যেত মহা-সন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,

আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা,
অনাগত মহা-ভবিষ্যৎ লাগি', হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারবার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি'
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি' জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে'।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমাপানে ; তুমি, সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মতো।

হে জলধি বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব-ভাষা। জানো কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাশ ও-পাশ ;
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা

বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো ; স্নিগ্ধ মাতৃপানি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি',
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বলো তারে "শান্তি। শান্তি।" বলো তারে
"ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।"

(১৭ চৈত্র, ১২৯৯) —সোনার তরী।

মানস-সুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয় ;—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত—এসো তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার,
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন,
তোমাতে আমাতে শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের স্বর্ণ মদিরা,—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কী আশা মেটেনি প্রাণে, কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা

না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক্ সৌম্য ম্লানকান্তি,
জীবনের দুঃখদৈন্য অতৃপ্তির 'পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।
বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানস-সুন্দরী
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও।—মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি' উঠে মর্মান্ত হরষে,—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।
অর্ধেক অঞ্চল পাতি বসাও যতনে
পার্শ্বে তব; সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে
ডাকো মোরে, বলো প্রিয়ে, বলো প্রিয়তম;—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সংগোপনে ব'লে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিম বর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরেস্তরে
সরসসুন্দর; নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো; আনন্দ-আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়

রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দু-জনে; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি' মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি' বাহুপাশে স্কন্ধে মুখ রাখি'
হাসিয়ো নীরবে অর্ধ-নিমীলিত আঁখি;
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
ব'লে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি; যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান; যদি মুগ্ধ প্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই রবো প্রিয়া।
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে, অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো; সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে; যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা রবো চাহি'
অপার তিমিরে; আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জনে; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি,

শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়-মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুটি হাত ত্রস্ত কপোতের মতো, দুটি
বক্ষ দুরুদুরু দুই প্রাণে আছে ফুটি'
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্যবিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে
বহু বাল্যকালে, দেখা হোত দুইজনে
আধো চেনা-শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা-মূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্যঃস্নান করি'
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি,
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি'
পাঠশালা-কারা হতে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্য-ভবনে

জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে ;
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জানো তার।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের 'পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক, নির্মল নির্ঝর স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভালো ক'রে
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধূলা ছুটাছুটি দু-জনে সতত,
কথাবার্তা বেশবাস বিথান বিতত।
তারপরে একদিন—কী জানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হতে
কখন অন্তর-লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি' আছ মহিষীর মতো। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া। পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি। ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষন নব পুষ্পদল
তোমার আনম্রশিরে আনন্দে আদরে।
সুন্দর সাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্লপথে

লজ্জা মুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিন তরে
আমার অন্তরগৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ ল'য়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশাভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসিঅশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বরসম; হাসিখানি স্থির,
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত, পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো; প্রীতিস্নেহ
গভীর-সংগীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ-বীণাতন্ত্রী হতে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি'। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত। কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি। সংগীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম। এই-যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে? এই-যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই-যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি

কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ? সৌন্দর্যপাথারে
যে বেদনা-বায়ু-ভরে ছুটে মনতরী,
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।
অভয়-আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই, বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

হাসিতেছ ধীরে
চাহি' মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা।
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর। কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু ব'লে কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি' লহ গো সবলে
আমার আমারে ; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সংগীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি'
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থরথর করি'।
নাইবা বুঝিনু কিছু, নাইবা বলিনু
নাইবা গাঁথিনু গান, নাইবা চলিনু
ছন্দোবন্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী

কাঁপিব সংগীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি' জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে; বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্তে'ই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনা-বাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কিগো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি, বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন;
শরৎ-প্রত্যূষে উঠি' করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে

গভীর অরণ্য-ছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাকো ; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায়
বসন বয়ন করো বকুলতলায় ;
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর-তীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মুলতান ;
কখন অজ্ঞাতে আসি' ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি' দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি', অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি'
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।
কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে
স্খলিত-বসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি'
চকিতে চমকি' চলি' যায়—জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,—
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মতো, বহুক্ষণ কাঁদি, স্নেহ-আলোকের
তরে, ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া ; অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও, চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে,

নয়ন চুম্বন করো, স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও, না কহিয়া বাণী
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন্ আবার
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে।

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা। এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে, সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর এক-ধারে
ধরিবে কি এক-খানি মধুর মুরতি।
নদী হতে লতা হতে আনি' তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া,
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে? কী নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি। কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দু-খানি হাতে। কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে।
কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্র গ্রীবা-'পরে
শিরীষ কুসুম সম সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমনে। শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে-গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয়—নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার,
নারীচক্ষে। কী সঘন পল্লবের ছায়,
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে

সুখবিভাবরী। অধর কী সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব। লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি'
অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি
নিঃসহ যৌবনে।

জানি, আমি জানি, সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে,—দাঁড়াব থমকি,
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা।—জানি মনে হবে মম
চির-জীবনের মোর ধ্রুবতারাসম
চির-পরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ।
আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা,
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে-মনে
চিনিবে আমারে। আমাদের দুইজনে
হবে কি মিলন। দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে। কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে, হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে। পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে। জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর

মাধুর্যে তোমার। বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে। জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি, গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল। কার এত দিব্য জ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি'। মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়া-ডোরে চির সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।

রজনী গভীর হোলো, দীপ নিবে আসে ;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন-যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণ-রেখা
মিলাইয়া গেছে, সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে, শেষ ঘট পূর্ণ ক'রে
কখন বালিকা বধূ চলে গেছে ঘরে।
হেরি' কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি একাদশী তিথি
দীর্ঘপথ, শূন্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী,—
কখন্ গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠপারে, কৃষি-পল্লী হতে নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটীরে
কখন জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যা-দীপখানি,
কখন নিভিয়া গেছে—কিছুই না জানি।
কী কথা বলিতেছিনু কী জানি, প্রেয়সী,
অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি'
স্বপ্নমুগ্ধমতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে, প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার। সব কথা গেছি ভুলে',
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গভীর নিঃস্বনে।
এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি',—শোয়াও যতনে
মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে।

(৪ পৌষ, ১২৯৯) —সোনার তরী

হৃদয়-যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয়-নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে'।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই-যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো মোর
হৃদয়-নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে';
হেথা শ্যামদূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি' কুঞ্জতৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কী-বা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।

সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি',
উচ্ছ্বসি' পড়িবে আসি' উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে।
যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহন-তলে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে' নিখিল বন্ধন খুলে'
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।

(১১ আষাঢ়, ১৩০০) —সোনার তরী

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;

দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে ; উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে ; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে ; যাই পরশিয়া,
স্বর্ণ-শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণ-লেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি' দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর,
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্ দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে,
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে-ইচ্ছা গোপন মনে
উৎস-সম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে—হৃদয়ের চারিধার

ক্রমে পরিপূর্ণ করি' বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি' দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি' শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কা'রা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে।—

স্থদুর্গম দূরদেশ,—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জলন্ত বালুকারাশি স্থচি বিঁধে চোখে
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধুলিশয্যা-'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে প'ড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।

কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি' বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ;—চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক-নির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন

প'ড়ে আছে শিকড় আঁকড়ি' ; হিম-রেখা
নীল গিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি' যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি' ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-দ্বারে।

মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘ রাত্রি-শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন। রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মতো।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি'
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে ; সমুদ্রের তটে
ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া ; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি

যেখানে যা-কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবস নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র হতে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনার তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি ;
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশ দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ,—নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি', সহিয়া আঘাত

অকাতরে ; পরিতাপ-জর্জর-পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য ক'রে চলে যায় আবেশে উল্লাসি',—
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সে-ও ভালবাসি—
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘু তরী সম।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ;—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি' অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা—
হিংসাতীব্র সে আনন্দ সে দৃপ্ত গরিমা
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ ;—
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি' বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি' ধরি এ বক্ষের কাছে

সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ ;
প্রভাত রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ-'পরে সারাদিন দুলি
আনন্দ-দোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দ চরণে বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশু পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি' ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলদল গন্ধরেণু ; তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি

সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর ; তোমার অন্তরে
কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ ; কুসুম-মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে ; নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনো দিন,—শরৎ কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান-রবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে, মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ-খেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার ; দূর করো সে বিরহ—
যে-বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে

বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে—মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূম-লেখা
সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে ;
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত ; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে,—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী 'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদ-ব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব মাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে,—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষস্বরে, উচ্ছ্বসি' উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য সংগীতে, প্রবাহি' যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানী যত, আনন্দের রস
কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোল-গীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হয়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে

হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাত-আলোক মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প। মোর মুগ্ধভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে, যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা,—প্রেমিকের দু-নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া, আছে সর্বাঙ্গ তোমার,
হে বসুধে, জীবস্রোত কত বারংবার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে। উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি'। আজ শতবর্ষপরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রবো না আমি। আসিব না নেমে

তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তাদের সর্বাঙ্গ মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্ত দিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুররূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে। করিব গমন
ছাড়ি' লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি'
এই সব তরুলতা গিরি নদী বন,
এই চির-দিবসের সুনীল গগন,
এ জীবন-পরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ।
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম-লতারূপে বারংবার ডাকি'
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে।—এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন্য-অমৃত-পিপাসা

মুখেতে রয়েছে লাগি', তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ।
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে' নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহ গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে-গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দূরে।

২৬ কার্তিক, ১৩০০) —সোনার তরী।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী।
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কী আছে হেথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে।

বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছল-ছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে।
তুমি হাসো, শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

হুহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,

অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন ;
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ,
তারি মাঝে বসি' এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন।
আমি তো বুঝি না কী লাগি' তোমার
বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে।'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে ;
দেখালে সমুখে প্রসারিত কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়,
সোনার ফলে।
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো
শান্ত ছবি।

বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়,
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির-তলে।
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি'।"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

(২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০) —সোনার তরী

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটিকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগত
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি'; অমর বীণায়
উঠিয়াছে কী ঝংকার। নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশ-বিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।—

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি'
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশী

ধ্যানরতা ; পুরূরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি' একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত ; গিরি-তটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায় ; বাঁশরির ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে ;—হাত ধ'রে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান.
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তা'রা নব নব গান
নব অর্থ-ভরা ; চির-সুহৃদ্‌সমান
সর্ব চরাচর। হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন,—সদা বহি

সংসারের ক্ষুদ্রভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্মাধীন,
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কী কারণে। অয়ি মহীয়সী মহারানী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। আজি
এই-যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর। তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি'
মন তব অভিনব লাবণ্য-বসনে।
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি সর্ব দেহ মন
পূর্ণ করি'; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি'; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট।

(১৪ মাঘ, ১৩০০) —চিত্রা।

সন্ধ্যা

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত করো শির। দিবা হোলো সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আনো
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পুরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে। রাখো রাখো অভিযোগ তব,-
মৌন করো বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ। হেরো, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল,
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্বাক নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়নপল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি করো অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে। বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি। অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে—মর্মান্তিক নীরবতা
করুক বিস্তার।

বসিয়া আপন দ্বারে ভালোমন্দ বলো তারে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুঃখে সুখে
আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক্‌ যে গেছে সে চলে যাক
বিস্মৃতির তীরে।

জানি না কিসের তরে যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,
ভালো মন্দ শেষ করি' যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।
দিয়ে যায় যত যাহা রাখো তাহা ফেলো তাহা
যা ইচ্ছা তোমার।
সে তো নহে বেচাকেনা, ফিরিবে না ফেরাবে না
জন্ম-উপহার।

কেন এই আনাগোনা কেন মিছে দেখাশোনা
দু-দিনের তরে;
কেন বুকভরা আশা, কেন এত ভালবাসা
অন্তরে অন্তরে,
আয়ু যার এতটুক এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে;
অকস্মাৎ এ সংসারে কে বাঁধিয়া দিল তা'রে
শত লক্ষ কাজে।

হেথায় যে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তা'র
জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি,
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তা'রে গাঁথিয়াছে আজি
'অর্থপূর্ণ করি'।

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল,
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল।—
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।

সে হয়তো দেখিয়াছে প'ড়ে যাহা ছিল পাছে
আজি তাহা আগে;
ছোট যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন
বড় হয়ে জাগে;
যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালি,
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়াছে জ্বালি'।

কত শিক্ষা পৃথিবীর খ'সে পড়ে জীর্ণচীর,
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয় নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতা-হুতাশনে ;
সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো।

আপন মনের মতো সংকীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ।
ভুলে যাও কিছুক্ষণ প্রত্যহের আয়োজন
সংসারের কাজ।
আজি ক্ষণেকের তরে বসি' বাতায়ন-'পরে
বাহিরেতে চাহ।
অসীম আকাশ হতে বহিয়া আসুক স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ।

উঠিছে ঝিল্লীর গান, তরুর মর্মর তান,
নদী কলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা, যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের 'পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্তস্বরে
সংগীত উদার,
সে-নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তা'রে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন,
তারে লয়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন,
এত আলাপন।
যে-বিশ্ব কোলের 'পরে চির দিবসের তরে
তুলে নিল তারে
তার মুখে শব্দ নাহি, প্রশান্ত সে আছে চাহি'
ঢাকি' আপনারে।

বৃথা তারে প্রশ্ন করি, বৃথা তার পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে ;—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে— কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে ;
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে ফিরে নিতে চাহি মিছে ;—
সে কি আমাদের।
পলেক বিচ্ছেদে হায় তখনি তো বুঝা যায়
সে-যে অনন্তের।

চক্ষের আড়ালে তাই কত ভয় সংখ্যা নাই ;
সহস্র ভাবনা।
মুহূর্ত মিলন হোলে টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে বসি' ধরি মুঠি শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি,
চাহি চারিভিতে,
অনন্তের ধনটিরে আপনার বুক চিরে
চাহি লুকাইতে।

হায় রে নির্বোধ নর, কোথা তোর আছে ঘর,
কোথা তোর স্থান।
শুধু তোর ওইটুক অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্ধ্বে ওই দেখ্ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ,
সে যখন এক-ধারে লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ।

ওই হেরো সীমাহারা গগনেতে গ্রহতারা
অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন 'পরে
কভু কোনোখানে
আর কি গো দেখা হবে আর কি সে কথা ক'বে
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক, ঘুচে যাক সর্বশোক,
সর্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্য-জন্ম-শিখা।
সব তর্ক হোক শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি বলো শান্তি, দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।

(১৩০১) —চিত্রা।

অন্তর্যামী

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি' অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে

বলিতেছিলাম বসি' এক-ধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে-ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি',
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি'
রহস্যে নিমগন।
এ-যে সংগীত কোথা হতে উঠে,
এ-যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ-যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,—
দেখে তুমি হাসো বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি'।
এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যে-দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই।
গ্রামের যে-পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে-পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে-পথ সে-পথের 'পরে
চলেছি পাগল-বেশে।
কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘন-পঙ্কিল,

কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম,—
খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধুলায় রৌদ্রে মলিন বরন,
আশে পাশে হতে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম।
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে।
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরান অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে।
খেপার মতন কেন এ জীবন।
অর্থ কী তার, কোথা এ ভ্রমণ।
চুপ করে থাকি শুধায় যখন
দেখে তুমি হাসো বুঝি।
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি-যে তোমারে খুঁজি।
রাখো কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
ব'লে দাও মোরে অয়ি।
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার।
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনাভরে গীত-ঝংকার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে।

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর।

হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর।
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে।
অর্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে।
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,

কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে।
জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সেদিন কি হবে সহসা সফল।
সেই শিখা হতে রূপ নির্মল
বাহিরি' আসিবে বুঝি।
সব জটিলতা হইবে সরল
তোমারে পাইব খুঁজি'।

ছাড়ি' কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
জীবনের শেষে কী নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি।
চির-দিবসের মর্মের ব্যথা,
শত জনমের চির-সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি।
ললাট আমার চুম্বন করি'
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি',
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি',
জানি না চিনিব কি না।
শূন্য গগন নীল নির্মল,
নাহি রবিশশী গ্রহমণ্ডল,

বহে না পবন, নাই কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা।
অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণ-বসন অঙ্গ জড়ায়ে,
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধভঙ্গে।

গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।

হাসি-মাখা তব আনত দৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি,
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত-বৃষ্টি
বরষি' করুণাভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহুবন্ধনে করেছ বন্ধ,
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু-বাষ্প-থরে।
নাহিক অর্থ, নাহিক তত্ত্ব,
নাহিক মিথ্যা, নাহিক সত্য,
আপনার মাঝে আপনি মত্ত,—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি।
আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি'॥

যদি কৌতুক রাখো চিরদিন,
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক, দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহ, তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও, প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখনো হৃদয়ে, কখনো বাহিরে,
কখনো আলোকে, কখনো তিমিরে,
কভু বা স্বপনে, কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।

বক্ষ-বীণায় বেদনার তার
এইমতো পুনঃ বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীত-ঝংকার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম-পাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু-নির্ঝর,
জানি না খুঁজিয়া কী মহাসাগর
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবস রজনী
অশ্রু-নদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে।

যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মতো ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী, কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।
এবারের মতো পুরিয়া পরান
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান;
সে-সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি'॥

(ভাদ্র, ১৩০১) —চিত্রা

সাধনা

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি',
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জানো মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি।

মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালোয় মন্দ, আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি'।
তবু ওগো দেবী, নিশিদিন করি' পরানপণ,
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।
ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবী, পলকে কেবল
করো কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেলো আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি॥

দেবী, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি'।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণা খানি।
তুমি জানো ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি' সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে-গানের আছিল আভাস,
যে-তান সাধিতে করেছিনু আশ,

সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
সুরহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি'
সকল অগীত সংগীতগুলি,
হৃদয়াসীনা,
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা॥

দেবী, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক,
যতদিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক
ধুলার মাঝে।
বলেছি যে-কথা করেছি যে-কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,

ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার-মাঝ
　　বিবিধ সাজে।
যা-কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
　　দিতেছি চরণে আসি'—
অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
　　বিফল বাসনা-রাশি।
ওগো　　বিফল বাসনা-রাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
　　হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবী, লহ কর পাতি',
আপনার হাতে রাখো মালা গাঁথি',
নিত্য নবীন র'বে দিনরাতি
　　সুবাসে ভাসি',
সফল করিবে জীবন আমার
　　বিফল বাসনা-রাশি॥

(৪ কার্তিক, ১৩০১)　　—চিত্রা।

ব্রাহ্মণ

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি' আহরণ
বনান্তর হতে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি'
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি,
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি' লয়েছে আসন

গুরু গৌতমেরে ঘিরি' কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে,—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—"বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।"

হেন কালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি' পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি' ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—
"ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর।"

শুনি' স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে—
"কুশল হউক সৌম্য, গোত্র কী তোমার।
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।"—

বালক কহিলা ধীরে,—
"ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য করো অনুমতি।"—
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি

গেলা চলি' সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।
ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি'; হেরি' তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
"কহ গো জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে,—গুরু কহিলেন মোরে,—
'বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।'—মাতঃ, কী গোত্র আমার।"

শুনি' কথা মৃদুকণ্ঠে অবনত মুখে
কহিলা জননী,—"যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু পরিচর্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত।"
পর-দিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,—
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি' বৃদ্ধ বটচ্ছায়

গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গ-কাকলীগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জল-কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত স্বর
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি' ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশীষ করি' শুধাইলা তবে,—
"কী গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়-দরশন।"—
তুলি' শির কহিল বালক,—"ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি,—সত্যকাম,
বহু-পরিচর্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।

শুনি' সে- বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময়-বিকল
কেহ-বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি' অহংকার।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি',—বালকেরে করি' আলিঙ্গন
কহিলেন, "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

(৭ ফাল্গুন, ১৩০১) —চিত্রা।

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর।"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি' "কেষ্টা,"—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে,
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দিই যবে "পাজি হতভাগা গাধা"
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্ব'লে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার—বড় পুরাতন ভৃত্য॥

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্তি, বলে "আর পারি নাকো,
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার,—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর।"
শুনে মহারেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধ'রে,—
বলি তারে "পাজি, বেরো তুই আজই দূর করে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়;—পর-দিন উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত,
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে, মোর পুরাতন ভৃত্য॥

সে-বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি'।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি' কশাকশি পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি',—
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায় ;—হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেন মতে আর কত বা সহিব নিত্য।
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি' পুরাতন ভৃত্য॥

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয় সাথে মিলি' একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হোলো আশা আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি,
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—"কেষ্টা আয় রে কাছে,
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি' তার মুখ ভ'রে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য॥

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।

বলে বার বার, "কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কাল-ব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু-দিন বন্ধ হইল নাড়ী।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি'।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য॥

(১২ ফাল্গুন, ১৩০১) —চিত্রা।

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে'।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই :
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।"
শুনি' রাজা কহে, "বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।"—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে-মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে-মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া ?"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিলা মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে॥"

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকল বিক্রি, মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি' দিল বিশ্ব নিখিল দু-বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোহর দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো॥

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধুলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা-গেহ;
স্তব্ধ অতল দিঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান্, চোখে আসে জল ভ'রে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজ-গ্রামে।
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি', রথ-তলা করি' বামে,
রাখি' হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি' পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে॥

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি।

সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা।
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস-বেশ,
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ।
আমি তোর লাগি' ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি' ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন ?
ধনীর আদরে গরব না ধরে, এতই হয়েছ ভিন্ন,
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সে-দিনের কোনো চিহ্ন।
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধা-হরা সুধারাশি ;
যত হাসো আজ, যত করো সাজ, ছিলে দেবী, হোলে দাসী॥

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি ;
প্রাচীরের কাছে এখনো-যে আছে সেই আম গাছ এ কি।
বসি' তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি' তাড়াতাড়ি ছুটি' আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে-জীবন।
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে-দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা॥

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী।
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব !"

চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধ'রে কাঁধে তুলি' লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ,
শুনি' বিবরণ ক্রোধে তিনি কন "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে, পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ, সাধু হোলে আজ, আমি আজ চোর বটে

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) —চিত্রা।

চিত্রা

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলক-গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল-চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত-যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত,

কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক-সম অসীমা
অয়ি প্রশান্ত-হাসিনী।
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩০২) —চিত্রা।

উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরি রূপসি ;
হে নন্দনবাসিনী উর্বশি !
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বালো সন্ধ্যাদীপখানি
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র-নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চলো সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা ॥

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশি।
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি' অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা ॥

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্বশি।
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,

মণিদীপ-দীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সংগীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে।
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা॥

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশি।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা॥

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশি।
ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশি।

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনি।

ওই শুন, দিশে দিশে তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী—
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশি।
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দু-পাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব সংগীতে
র'বে তরঙ্গিতে॥

ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে।
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রু-রাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে॥

(২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩০২) —চিত্রা।

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে ;—পুণ্যবল হোলো ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,
হে দেব হে দেবীগণ। বর্ষলক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি উদাসীন
চেয়ে আছে সদা ; লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে ;—অশ্বত্থ-শাখার
প্রান্ত হতে খসি' গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যত মোরা শতশত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যু-স্রোতে।
সে-বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হোত মর্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ;—নন্দনকানন
মর্মরিয়া উঠিত নিঃশ্বসি', মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী

কলকণ্ঠে, সন্ধ্যা আসি' দিবা অবসানে
নির্জন প্রান্তর-পারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসীন ; নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লীমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য-সংগীত
নক্ষত্রসভায়। মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হোত। হেলি' উর্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝংকারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্ছনা। দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি' একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি' পিপাসার বারি। ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি' আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস—খসি' ঝরি'
পড়িত নন্দনবনে কুসুম-মঞ্জরী।

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান,
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে-যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু-দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু-দণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধুলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়

জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেম-বেদনায়
কভু না হউক ম্লান—লইনু বিদায়।
তুমি কারে করো না প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে-বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি' সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হোলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরি-সংগীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্ত-সীমায় মঙ্গলসিন্দূরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু

সংসারের সমুদ্র-শিয়রে। দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্ন-সম—যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের ;—মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি' উঠি' গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা।
অয়ি মর্ত্যভূমি, আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পুরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনাপ্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদী-পারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে-শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি' পড়ি' তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে-অশ্রু শুকায়ে গেছে ; তব জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দু-খানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে,
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,—
আমারে লইবে চিরপরিচিতসম,—
তার পরদিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি' র'বে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন্ হারাই।

(২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০২) —চিত্রা।

বিজয়িনী

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি' শিহরি'। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়-সঘন

পল্লবশয়ন-তলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে ; কপোত-দম্পতি
বসি' শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত,—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে,—আয়ু-পরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি' কটিদেশ
মৌন অপমানে ;—নূপুর রয়েছে পড়ি'
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনক দর্পণখানি চাহে শূন্যপানে
কার মুখ স্মরি'। স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেতকরবীর মালা,—ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মতো।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুক-ভরা আলিঙ্গনরাশি। সরসীর
প্রান্ত-দেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী,—কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে—বক্ষে লয়ে টানি'

সযত্ন-পালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ,—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে'
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি' স্কন্ধ-'পরে, কহিতেছে বারংবার
স্নেহের প্রলাপবাণী—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে ; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে,
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলিঘাতে সংগীত ঝংকারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল,—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল,—বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবর-প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য-কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল ;—তৃণাঙ্কিত তীরে
জল কলকলস্বরে মধ্যাহ্ন-সমীরে

সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি'
ধূসর ডানার মাঝে ; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি' সত্বর চঞ্চল
ত্যজি' কোন দূর নদী-সৈকত বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ ব'হে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।
মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র-কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু-'পরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে ;
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী-মালা কুঞ্চিত কুন্তলে
গৌর কণ্ঠতটে,—সহাস্য কটাক্ষ করি'
কৌতুকে দেখিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর অঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্মল কোমল
বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি', লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি' ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে ; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ ; বসন্ত-পরশে
পূর্ণ ছিল বনকায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি' গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু-'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি' তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুমিল তার,—সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি' নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া ;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।
ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।

সম্মুখেতে আসি'
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে ; পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি' বসি', নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর-ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার

তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

(১ মাঘ, ১৩০২)

জীবন-দেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি' অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙারি' বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত-যে বরন, কত-যে গন্ধ,
কত-যে রাগিণী কত-সে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর-শয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব॥
আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।

লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ
আমার রজনী, আমার প্রভাত,
আমার নর্ম, আমার কর্ম,
তোমার বিজন বাসে।

বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে।

মানস-কুসুম তুলি' অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবন বনে।

কী দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি।
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি।

পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি'।

যে-সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি।

তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি॥

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা-কিছু আছিল মোর।
যত শোভা, যত গান, যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরা-বিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আর বার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে॥

(২৯ মাঘ, ১৩০২)

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে

ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে;
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
মধুর আবেশ ভরে ॥

তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি'
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন,
মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি',
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
নবীন মিলন সুখে ॥

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।

তুমি বামকরে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়-তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠেছে বাজি'।
এই নির্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবী-তীরে আজি॥

দেবী, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি' শঙ্খ বলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি'
প্রভাতে দিতেছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি'
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রম-ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে॥

(১ ফাল্গুন, ১৩০২) --চিত্রা।

১৪০০ সাল

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোন রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শত বর্ষ পরে॥
তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি' কল্পনায় অবগাহি'
ভেবে দেখো মনে—
এক-দিন শত বর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি'
নিখিলের মর্মে আসি' লাগে,—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন-হীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা

যৌবনের রাগে
তোমাদের শত বর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—
কত কথা, পুষ্প প্রায় বিকশি' তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শত বর্ষ আগে॥

আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত-দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে॥

(২ ফাল্গুন, ১৩০২) —চিত্রা

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
        পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
        মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
        বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
        নুয়ে বুঝি নামিবে ভূতল,
        রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
        থরে থরে ফলিয়াছে ফল॥

তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে,
এসো মোর সার্থক-সাধন।
        লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
        জীবনের সকল সম্বল,
        নীরবে নিতান্ত অবনত
        বসন্তের সর্ব সমর্পণ ;
        হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
        বনের বেদন-নিবেদন॥

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি' ফেলো বৃন্তগুলি,
        সুখাবেশে বসি' লতামূলে
        সারাবেলা অলস অঙ্গুলে

বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি' তুলি',
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি ॥

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মর নিঃশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল ॥

(১৩ চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি

দেবতার বিদায়

দেবতা-মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি' নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে-গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে—"গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাঁই।"

সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল "চলিলাম ;"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি' দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া-তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

(১৪ চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি।

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে।"
দেবতা কহিলা "আমি।" শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা "আমি।" কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি', "তুমি কোথা প্রভু,"
দেবতা কহিলা "হেথা।" শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি',
দেবতা কহিলা "ফিরো।" শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়॥"

(১৪ চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরি ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা; কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে,—আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার; পিতল কঙ্কণ
পিতলের থালি 'পরে বাজে ঠন্ ঠন্;—
বড় ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোট ভাই,
নেড়া মাথা কাদা মাখা গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি' থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি' শিশুকর; জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

(২১ চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি

পদ্মা

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,

সাক্ষী করি' পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।
অবসান সন্ধ্যাকালে আছিলে সেদিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়েছিল তোমাপানে হাসিভরা মুখে।
সেদিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার॥

নানাকর্মে মোর কাছে আসে নানাজন,
নাহি জানে আমাদের পরান-বন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন-পাতা নির্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাকদল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি' কোলাহল;
যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্বতীরে
রুদ্ধ হয়ে যায় দ্বার কুটীরে কুটীরে,
তুমি কোন গান করো আমি কোন গান
দুই তীরে কেহ তার পায়নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
কতবার দেখা শোনা তোমায় আমায়॥

কতদিন ভাবিয়াছি বসি' তব তীরে,—
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে,—
কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাড়

পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?
জন্মান্তরে শতবার যে-নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
আর বার সেই তীরে সে-সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখা শুনা তোমায় আমায়।

(২৫ চৈত্র, ১৩০৩) —চৈতালি।

বঙ্গমাতা

পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধ'রে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি ক'রে, মানুষ করো নি॥

(২৬ চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হতে। বসি' কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি' করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা॥

২৮ চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি।

কালিদাসের প্রতি

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী,—কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস,—রাজ-অধিরাজ।

কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি' উমাপতি ভূমানন্দ-ভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জ্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা-গান,—গীতসমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি' স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া-'পরে॥

(১১ শ্রাবণ, ১৩০৩) —চৈতালি।

কুমারসম্ভব গান

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতীরে
কুমারসম্ভবগান,—চারিদিকে ঘিরে'
দাঁড়াল প্রমথগণ,—শিখরের 'পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘস্তর,—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জ্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি' পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীব্রা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ,—কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল,—কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি' দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্তগানে॥

(১৫ শ্রাবণ, ১৩০২) —চৈতালি।

পতিতা

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার।

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে-কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,—
আমি তারি এক বারাঙ্গনা॥

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।

পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব অচলে উষার মতো,
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত।

মনে হোলো মোর নব-জনমের
উদয়শৈল উজল করি'
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি'॥

তরুণীরা মিলি' তরণী বাহিয়া
পঞ্চমস্বরে ধরিল গান,
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
মৃগশিশুসম পাতিল কান।

সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
মুনি-বালকেরে ফেলিয়া কাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি' ঘিরিয়া ফিরিয়া
নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।

নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদীজল-তলে বাজিল শিলা,
ভগবান্ ভানু রক্ত-নয়নে
হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা॥

প্রথমে চকিত দেবশিশু সম
চাহিলা কুমার কৌতূহলে,—
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
পড়িল তাঁহার পথের তলে।

দেখিতে দেখিতে ভক্তি-কিরণ
দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে,—
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে

বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি',
বন্দনা-গান রচিলা কুমার
জোড় করি' কর-কমল দুটি।

করুণ কিশোর-কোকিল কণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তি-মগন
পাতায় পাতায় শিহরি' উঠে।

যে-গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয়নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা
নির্জন গিরিশিখর 'পরে।

সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীল নির্বাক সিন্ধুতলে,
শুনে গ'লে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশির শীতল অশ্রুজলে।

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি'।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।

ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি',
কহিনু,—"হে মোর প্রভু তপোধন,
চরণে আগত অধম দাসী।"

তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে।
জানু পাতি' বসি' যুগল চরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।

তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
　　ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো,—
তাপস কুমার চাহিলা, আমার
　　মুখপানে করি' বদন নত।

প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
　　সে-দুটি সরল নয়ন হেরি'
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
　　বাজায়ে উঠিল বিজয়-ভেরী।

ধন্য রে আমি ধন্য বিধাতা
　　সৃজেছ আমারে ধন্য করি'।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
　　উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি'।

জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
　　কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
　　বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

কহিলা কুমার চাহি' মোর মুখে—
　　"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা।
তোমার পরশ অমৃত-সরস,
　　তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
　　স্বর্গ মেনেছে এ-দেহখানি,—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
　　শুনিনি এমন সত্যবাণী।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।

সেইখানে এল আমার তাপস,
সেই পথহীন বিজন গেহ,—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোনোদিন আসেনি কেহ।

সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে,—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।

আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে,—
এ-বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

কহিলা কুমার চাহি' মোর মুখে,
"আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি'।"

শুনি' সে-বচন, হেরি' সে-নয়ন
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত নির্মল-রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।

প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
সঁপি' দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি' নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন এসে।

যতেক পামরী পাপিনীর দল
খলখল করি' হাসিল হাসি,—
আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে
চারিদিক হতে ঘেরিল আসি'।

বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি' পড়ে কবরী টুটি',
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি' হস্ত ছুটি॥

হে মোর অমল কিশোর তাপস
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি।
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।

হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি, দিতাম টানি'
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত শরমখানি।

ও-আহুতি তুমি নিয়ো না নিয়ো না
হে মোর অনল, তপের নিধি,
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি।

ধিক্ রমণীরে ধিক্ শতবার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক।
রমণীজাতির ধিক্কার-গানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক।

ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্নলতিকাসম।
কহিনু তাপসে—"পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা।

আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি।"—
হরিণীর মতো ছুটে চ'লে এনু
শরমের শর মরমে বিঁধি'।

কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে
"আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি"—
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি'।

ফেলি' দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবন-তরু করুণা মানি',
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী,—

"আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা।
অমৃতসরস তোমার পরশ;
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"—

দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।

তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া র'বে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার,
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে॥

(৯ কার্তিক, ১৩০৪) —কাহিনী

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥
এ নহে মুখর বন-মর্মরগুঞ্জিত,
এ-যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে;

কোথারে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথারে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে ;
বিশ্ব-জগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি'
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে ;
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি'
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি' অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি' তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া,
বহুদূর তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা।

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

(* বৈশাখ, ১৩০৪ —কল্পনা

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িত-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণ-রসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ॥

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
  এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
    ওগো প্রিয়সুখ-ভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ-পাতায় নব গীত করো রচনা
    মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
  কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
    অঞ্জন আঁকো নয়নে।
  তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
  ভবন-শিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
    স্মিত-বিকশিত বয়নে ;
  কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল শয়নে॥

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
  শশী-তারা-হীনা অন্ধতামসী যামিনী ;
    কোথা তোরা পুর-কামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
    চমকে দীপ্ত দামিনী ;
  শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুর-কামিনী॥

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা।
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥

(১৩০৪) —কল্পনা।

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী-পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,

তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে' চিনে'।

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীরমন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি,—উর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণপথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি' দম্ভ ভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেনকালে হাতে দীপ-শিখা
ধীরে ধীরে নামি' এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা-করে।
অঙ্গের কুসুমগন্ধ কেশ-ধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্লান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়॥

মোরে হেরি' প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি'
নীরবে শুধাল শুধু সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?"—মুখে তা'র চাহি'
কথা বলিবারে গেনু,—কথা আর নাহি।
সে-ভাষা ভুলিয়া গেছি,—নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত,—মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি' দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি'
আমার দক্ষিণকরে,—কুলায়-প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো ; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে ;—ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি' নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি' দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিভিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদী-তীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

(১৩০৪) —কল্পনা

মদনভস্মের পূর্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু-পবনে
পথিক-বধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হোত সুরার মতো সুরভি
পরান হোত অরুণবরনী॥

সন্ধ্যা হোলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হোলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুল-মুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ সাথে হরিণী আসি' চাহিত দীন নয়ানে
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী॥

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু, প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি' করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি'
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণশয়ন-তলে ছড়ায়ে মধু-মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী
নূপুর দুটি বাজাত লালসে॥

কানন-পথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনা-কূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি' আকুল নয়নে।
বাহিয়া তব কুসুম তরী সমুখে আসি' হাসিতে,
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া॥

তেমনি আজো উদিছে বিধু মাতিছে মধু-যামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি' কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে
মাঝেতে বহে বিরহ-বাহিনী।
গোপনব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি' সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী॥

এসো গো আজি অঙ্গ ধরি' সঙ্গে করি' সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এসো চতুর মধুরহাসি তড়িৎসমা সহসা
চকিত করো বধুরে হরষে,
নবীন করো মানব-ঘর ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে॥

(১৩০৪) —কল্পনা

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি'
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি' উঠি' মুরছি পড়ে অবনী॥

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি' ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন পিপাসা॥

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।

পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি'
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ॥

(১৩০৪) —কল্পনা

পিয়াসী

আমি তো চাহিনি কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নিচু।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশির লোর।

নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাত বায়ে ;
তুমি একাকিনী কুটীর-বাহিরে
বসিয়া অশথ-ছায়ে
নবীন-নবনী-নিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ ;
আমি তো কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ ॥

আমি তো কহিনি কথা।
বকুলশাখায় জানি না কী পাখি
কী জানালো ব্যাকুলতা।
আম্র-কাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে ;
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি ক'রে
মৌমাছি উড়ে' আসে।

সরোবর-পারে খুলিছে দুয়ার
শিব-মন্দিরঘরে,
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীরস্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি' তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ ;
শূন্যপাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ॥

আমি তো যাইনি কাছে।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কী জানি কী করিয়াছে।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে
আকাশ উঠিছে জাগি'
ধরণী চাহিছে ঊর্ধ্বগগনে
দেবতা-আশিস মাগি'।

গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে
উড়িছে গোখুর-ধূলি,—
উছলিত ঘট বেড়ি' কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি।

তোমার কাঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ ;
পিয়াসী নয়নে ছিনু এক কোণে
পরান নীরবে ক্ষুব্ধ ॥

(১৩০৪) —কল্পনা

পসারিনী

ওগো পসারিনী দেখি আয়,
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি'
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।
কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।
সম্মুখে দেখো তো চাহি,' পথের-যে সীমা নাহি,
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিনী কথা রাখো, দূর পথে যেয়োনাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে ॥

হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল ;
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারিপাশে কচিকচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকন-কোমল ;
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।

থাক্ তব বিকি-কিনি ওগো শ্রান্ত পসারিনী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল ॥

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি' পরি' নিবে গলে।
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি' আনি' মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক,
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লী-রবে কী মন্ত্র শ্রবণে ক'বে,
মুদে যাবে চোখের পলক।
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড়ো ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালসঘোর;
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোনো শঙ্কা নাহি তোর ॥

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য যায় পাটে,
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে,
নাই গেলে বহুদূরে, বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে।
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাব আগে;
শশীহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত,
যদি মনে বড় ভয় লাগে।
শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি',
দুগ্ধ-দোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি ॥

ওগো পসারিনী

মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দগ্ধপথে উড়ে তপ্ত বালি,
দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি ॥

(১৩০৪) —কল্পনা

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল-রবে।
অলস চরণে বসি' বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধাল কাতরে—"সে কোথায়, সে কোথায়।"
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি',—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"নবীন পথিক, সে-যে আমি, সেই আমি॥"

গোধূলি-বেলায় তখনো জ্বলেনি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ;—
কনক-মুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে—
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন-মনে।

হেনকালে এল সন্ধ্যা-ধূসর পথে
করুণ-নয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্ম্মে আকুল অশ্বগুলি,
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধাল কাতরে—"সে কোথায়, সে কোথায়।"
ক্লান্ত চরণে আমারি দুয়ারে নামি',
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"শ্রান্ত পথিক, সে-যে আমি, সেই আমি॥"

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী,
দুয়ার সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী,
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর গেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠি পরেছি কাঁচলখানি,
দূর্ব্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি'।
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি—
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযাত্রা যামিনী একা বসে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে-যে আমি, সেই আমি॥"

(* আশ্বিন, ১৩০৫) —কল্পনা।

শরৎ

আজি কী তোমার মধুর মুরতি
  হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
  ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
  তোমার কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
  শরৎকালের প্রভাতে॥

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
  গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
  তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার
  আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম-পথে-পথে গন্ধ তাহার
  ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বানলিপি
  পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে॥

তুলি' মেঘভার আকাশ তোমার
  করেছ সুনীলবরনী ;

শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশিদিশি হতে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধশীতল ধরণী॥

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন ;
হাসি-ভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে॥

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,

কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া॥

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী॥

(* অগ্রহায়ণ, ১৩০৫) —কল্পনা।

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহেনি কথা;
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা॥
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে।
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে॥
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি।
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি'॥
এত-যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে।
সে-কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে॥

না জানি সে-কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি।
লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি' ॥
ফুলের মতন ছিল সে মৌন, মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপন-মাখা।
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা-বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে ॥
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি' কোণে জানিত রচিতে ঘনগম্ভীর মায়া ॥

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে,
হেন সংশয় ছিল না কাহারো, সে-যে কোনো কথা বোঝে।
বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিলনাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে ॥
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু।
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি'
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুল-ধূলি ॥

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালবাসা
এরে দেখি' হেসে ভাবিত এ লোক জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি' তপনের পানে
ভাবিত এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিতে নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে,
ভাবিত, এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে।
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মর-কথা ॥

একদা ফাগুনে সন্ধ্যা-সময়ে সূর্য নিতেছে ছুটি,
পূর্ব গগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি ;
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে।
কোনো সাহসিকা ছুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি'
না চাহে নামিতে না চায় থামিতে না মানে বিনয়বাণী।
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে।
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে॥

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল—নরনারী, শুন সবে,
কতকাল ধ'রে কী-যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে।
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত—আকাশের চাঁদ চাহি'
পাণ্ডু-কপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ নাহি।
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে-যে জলে।
এতকাল ধ'রে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে।
এত-যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে।
বড় বড় যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে॥

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল শরমে গগন ভরি'।
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি',
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা।
দখিন-বাতাসে ব'লে গেল তারে, সকলি পড়েছে ধরা।
শুনে ছিছি ব'লে শাখা নাড়ি' নাড়ি' শিহরি' উঠিল লতা,
ভাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কী রটাবে কথা।
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়—যে-ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত॥

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়া হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি।
"হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ" হাসিয়া সবাই কহে—
"যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে।"
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি'—
"আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি।"
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
"ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি' গেল তুমি আমি কোথা আছি॥"

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি'।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা,—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা॥

(১৩০৪ ?) —কল্পনা।

অশেষ

আবার আহ্বান ?
যত কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান॥
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন,

প্রখর পিপাসা হানি', পুষ্পের শিশির টানি'
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ন ম্লান হেসে
হোলো অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে,
আবার আহ্বান?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল-'পর টানি' দিল ঝিল্লীস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে কালি ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা;
গাঢ় সে-তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়ন-পল্লব'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান;
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতিসম;
এখনো আহ্বান?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি' সকল সমাপ্ত ভেদি'
তোমার আদেশ।

বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান।

দক্ষিণসমুদ্র-পারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে
হে জাগ্রত রানী,
বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী।
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখিগণে
আঁধার শাখায়।
তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায়।
লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো আহ্বান ?

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়া তরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ওপারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে প'ড়ে যাক খসি'
কুটীরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ,

আবার চলিনু ফিরে বহি' ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান ॥

বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব
কী করিব কাজ।
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়োনাকো ঘৃণাভরে, কোরোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান ॥

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি'
পথের দু-ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি' বিদায় পাইনে দেবী
ডাকো ক্ষণে ক্ষণে;
বেছে নিলে আমারেই দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্ব্বে জাগি' রবো সারারাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়ান,
সেই গর্ব্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্য-সম
তোমারি আহ্বান ॥

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি' দীর্ঘরাত্রি রবো জাগি',
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করি' যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা ক'রে
তোমার আহ্বান॥

(* জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) —কল্পনা।

বর্ষশেষ

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে
বাধাবন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান :
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান॥

ধূসর-পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরায় নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীর-প্রান্তে আসি'।

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি।
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি॥

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকার ঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চস্বর।
হৃদয় নির্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিঃশ্বাসে॥

আনন্দে আতঙ্কে মিশি' ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি' উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়॥

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি'
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি' লুপ্ত করি' স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।

কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি' অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহ ক্ষণকাল ॥

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণবেগে
বিদ্ধ করি' হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে ॥

এবার আসো নি তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি',
এবার আসো নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,—
ধন্য ধন্য তুমি।
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্বিত নির্ভয়,—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,—
জয়, তব জয় ॥

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি' চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—

পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি' বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে ॥

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জানো।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চি-রেখা;
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা ॥

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি', আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান ॥

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি’,—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি’ ॥

শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধুমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি’
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় ॥

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে-পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক’রে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি ক’রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে ॥

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ করো হৃতপত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,

ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ ॥

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন ;
মেঘের অনন্ত পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লীরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি' দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথ-গগনে ॥

(৩০ চৈত্র, ১৩০৫) —কল্পনা

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধুসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি' বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ ॥

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি' উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে

নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর ॥

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বসো আসি' রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী ॥

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি-শিখা, লেহি' লেহি' বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি' ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার ॥

হে বৈরাগী করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি' গ্রাম হতে গ্রামে
পূর্ণ করি' মাঠ।
হে বৈরাগী করো শান্তিপাঠ ॥

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থ-ছায়াতে,
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে ॥

সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধুলাসম উড়ুক গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ।
সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ॥

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি' নভস্তলে,—বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি' গেরুয়া অঞ্চল॥

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ,
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন-তন্দ্রা জাগি' উঠি' বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রবো প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ॥

(১৩০৬) —কল্পনা।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

(অবদানশতক)

"প্রভু বুদ্ধ লাগি' আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি',"—
অনাথ-পিণ্ডদ * কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

* অনাথ-পিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

সত্ত মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগন-লগন-
প্রাসাদে ॥

বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান,
এখনো ধরে নি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।
ভিক্ষু কহে ডাকি'—"হে নিদ্রিত পুর,
দেহ ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর"—
সুপ্ত পৌরজন শুনি' সেই সুর
শিহরে ॥

সাধু কহে, "শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্মমাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে।"
কৈলাসশিখর হতে দূরাগত
ভৈরবের মহা-সংগীতের মতো
সে-বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রা-রত
ভবনে ॥

রাজা জাগি' ভাবে বৃথা রাজ্যধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন,
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।

যে-ললিত সুখে হৃদয় অধীর,
মনে হোলো তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা ॥

বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুম-ভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে
অন্ধকার পথ কৌতূহল ভরে
নেহারি'।
"জাগো ভিক্ষা দাও" সবে ডাকি' ডাকি',
সুপ্ত সৌধে তুলি' নিদ্রাহীন আঁখি,
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারী ॥

ফেলি' দিল পথে বণিক-ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি' রতন-কণিকা,
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে' পূরে',
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে,
ভিক্ষু কহে—"ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহ গো ॥"

বসনে ভূষণে ঢাকি' গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলি,
সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে—

"ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান,
দেহ তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে ॥"

ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।
রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহা-নগরীর পথ হোলো শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে ॥

দীন নারী এক ভূতল-শয়ন,
না ছিল তাহার অশন-ভূষণ,
সে আসি' নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।
অরণ্য-আড়ালে রহি' কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে ॥

ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়-নাদ,
কহে—"ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহা ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।"

চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-
আলোকে ॥

(৫ কার্তিক, ১৩১৪) —কথা।

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি' গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সংগমে
তীর্থস্নান লাগি'। সঙ্গীদল গেল জুটি'
কত বাল বৃদ্ধ নর নারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।
পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি', "হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী।" বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে,—অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়।—"স্থান কোথা আর,"
মৈত্র কহিলেন তারে। "পায়ে ধরি তব"
বিধবা কহিল কাঁদি', "স্থান করি' লব
কোনোমতে একধারে।" ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধাল ব্রাহ্মণ,
"নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে।"
উত্তর করিলা নারী—"রাখাল? সে র'বে

আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে
বাঁচিব ছিল না আশা ; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে,—সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত, মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মা'র চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।"
সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল—বাঁধি' জিনিসপত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে—সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি' দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি',
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি'
নিশ্চিন্ত নীরবে। "তুই হেথা কেন ওরে।"
মা শুধাল ; সে কহিল, "যাইব সাগরে।"
"যাইবি সাগরে, আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।" পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা "যাইব সাগরে।"
যত তার বাহু ধরি' টানাটানি করে,
রহিল সে তরণী আঁকড়ি'। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
"থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক।" মা রাগিয়া বলে
"চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপ-বাণে

বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি'—তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণ হস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি' ধীরে চুপি চুপি কয়,
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।"
রাখাল যাইবে সাথে স্থির হোলো কথা,—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি' সে বারতা
ছুটে আসি' বলে, "বাছা, কোথা যাবি ওরে।"
রাখাল কহিল হাসি', "চলিনু সাগরে
আবার ফিরিব মাসি।" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি', "ঠাকুর মশায়,
বড় যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,—
কে তাহারে সামালিবে। জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকেনি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে। ফিরে দিয়ে যাও।"
রাখাল কহিল—"মাসি, যাইব সাগরে
আবার ফিরিব আমি।" বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন—"যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি' কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা—পথের বিপদ
কিছু নাই,—যাতায়াতে মাস দুই কাল,—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।"
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি' নৌকা দিল ছাড়ি'।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রু-চোখে। হেমন্তের প্রভাত-শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে ; সাঙ্গ হোলো মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণ বেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি'।—জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি' লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রব-সহা আনন্দভবন
শ্যামল কোমলা। যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু-বাহু মেলি' টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্ত-বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ পানে॥

চঞ্চল বালক আসি' প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুককণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে
"ঠাকুর, কখন্ আজি আসিবে জোয়ার
সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ ; মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান,—কলশব্দ গীতে
সিন্ধুর বিজয়-রথ পশিল নদীতে,—

আসিল জোয়ার।—মাঝি দেবতারে স্মরি'
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি' ব্রাহ্মণের কাছে,
"দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে।"

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে,
উত্তর বায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি' বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। "তরণী ভিড়াও তীরে,—"
উচ্চকণ্ঠে বারংবার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর। চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতি দূর তটপ্রান্তে নীল বনরেখা;—
অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীত-পবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি' উর্ধ্বডাক,
ডাকি' আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি' করে জপ। জননীর বুকে

রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে—
"বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানৎ রক্ষা—করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।" যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি' দিল
না করি' বিচার। তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার—"দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।"
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি'—"এই-সে-রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।"—"দাও তারে ফেলে"—
একবাক্যে গর্জ্জি' উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, "হে দাদাঠাকুর
রক্ষা করো রক্ষা করো।" দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি' ধরে।
ভর্ৎসিয়া গর্জ্জিয়া উঠি' কহিলা ব্রাহ্মণ,
"আমি তোর রক্ষাকর্ত্তা; রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে;
শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে,
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে?"

মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,

সেই সত্য হোলো। সে-যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝোনি ঠাকুর।
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা।"
বলিতে বলিতে যত মিলি' মাঝি দাঁড়ি
বল করি' রাখালেরে নিল ছিঁড়ি' কাড়ি'
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি' দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি'
দন্তে দন্ত চাপি' বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা
দংশিল বৃশ্চিক-দংশ।—"মাসি, মাসি, মাসি"
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি'
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি' উঠিল বিপ্র—"রাখ্ রাখ্ রাখ্।"
চকিতে হেরিল চাহি' মূর্ছি' আছে প'ড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ মাঝে মেলি' আর্ত চোখ
"মাসি" বলি' ফুকারিয়া মিলাল বালক
অনন্ত তিমির-তলে ;—শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুলবলে ঊর্ধ্ব পানে উঠি'
আকাশে আশ্রয় খুঁজি' ডুবিল হতাশে।
"ফিরায়ে আনিব তোরে", কহি' ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত-মাঝে ঝাঁপ দিল জলে,
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে॥

(১৩ই কার্তিক, ১৩০৪) —কথা ও কাহিনী

অভিসার

(বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা)

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত ;—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ-গগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত ॥

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি' জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ॥
নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ,
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা ॥
প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার নবীন গৌর-কান্তি।
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি ॥
কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা,
"ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা ॥"

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে, “অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে ॥”
সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে হাসিল অট্টহাস্য ॥

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা ॥
অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মদির-মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি' নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র ॥

নির্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি' উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর আজি অভিসার রাত্রি

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী বাহির প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি' পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে,
কে ওই রমণী প'ড়ে একধারে তাঁহার চরণোপান্তে ॥

নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালি তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি' পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ ॥

সন্ন্যাসী বসি' আড়ষ্ট শির তুলি' নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি' দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি' দিল দেহ আপনার করে শীত চন্দনপঙ্কে ॥

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়
"আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা ॥"

(১৯শে আশ্বিন, ১৩০৬) —কথা।

স্পর্শমণি

(ভক্তমাল)

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন "কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর।"
বিপ্র কহে, "কী বা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি' বহুদূর ;

জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে,
এত বড় ভাগ্য-হত দীন হীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমিজমা আছে কিছু, ক'রে আছি মাথা নিচু,
অল্প স্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞ যাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি' শিব কাছে বর মাগি
করি' আরাধনা।—
একদিন নিশি-ভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে—
"পুরিবে প্রার্থনা ;
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়,
তাঁরে পিতা বলি' মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়॥"
শুনি' কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
"কী আছে আমার।
যাহা ছিল সে-সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি'—
ভিক্ষা মাত্র সার॥"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে,—সাধু ফুকারিয়া উঠে
"ঠিক বটে ঠিক।
একদিন নদী-তটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ-মানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হোক দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি', খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে-মণি,
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি',
ছুঁইল যেমনি ॥
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী-যে।
নদী-পারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রু-জলে,—
"যে-ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি,
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।"—এত বলি' নদী-নীরে
ফেলিল মানিক ॥

(২৯ আশ্বিন ১৩০৬) —কথা।

বন্দী বীর

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ ॥

"অলখ নিরঞ্জন—"
মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়-ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্ঝন্।
পাঞ্জাব আজি গরজি' উঠিল—"অলখ নিরঞ্জন॥"

এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চ নদীর ঘিরি' দশ তীর এসেছে সে এক দিন॥

দিল্লি-প্রাসাদ-কূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে, নিবিড় নিশীথ টুটে,
কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে॥

পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কি রে।
লক্ষ বক্ষ চিরে'
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষীসমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরাল পঞ্চ নদীর তীরে॥

মোগল শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি' ধরিল আঁকড়ি' দুই জনা দুই জনে,
দংশন-ক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
সেদিন কঠিন রণে
"জয় গুরুজীর" হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল "দীন্ দীন্" গরজনে॥

গুরুদাসপুর গড়ে

বন্দা যখন বন্দী হইল তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত বাঁধি' লয়ে গেল ধ'রে
দিল্লি নগর 'পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল গুরুদাসপুর গড়ে॥

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া বর্শাফলকে তুলি'।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ 'পরে লোক নাহি ধরে বাতায়ন যায় খুলি'।
শিখ গরজায় "গুরুজীর জয়" পরানের ভয় ভুলি'।
মোগলে ও শিখে উড়াল আজিকে দিল্লি-পথের ধূলি॥

পড়ি' গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি' তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজীর" কহি' শত বীর শত শির দেয় ডারি'॥

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি' বন্দার এক ছেলে,
কহিল, "ইহারে বধিতে হইবে নিজ হাতে অবহেলে।"
দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার বাঁধা বাহু তার বন্দার এক ছেলে॥

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে লইল বক্ষে টানি'।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে রাখে দক্ষিণপাণি,

শুধু একবার চুম্বিল তার রাঙা উষ্ণীষখানি।
তার পরে ধীরে কটিবাস হতে ছুরিকা খসায়ে আনি',
বালকের মুখ চাহি'
"গুরুজীর জয়" কানে কানে কয়,—"রে পুত্র, ভয় নাহি॥"

নবীন বদনে অভয় কিরণ জ্বলি' উঠে উৎসাহি'—
কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল বালক উঠিল গাহি',—
"গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়" বন্দার মুখ চাহি'॥
বন্দা তখন বামবাহুপাশ জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে,
"গুরুজীর জয়", কহিয়া বালক লুটাল ধরণীতলে॥

সভা হোলো নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি' একটি কাতর শব্দ
দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হোলো নিস্তব্ধ॥

(৩০শে আশ্বিন, ১৩০৬) —কথা

উদ্বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিসনে আর, বাঁধিসনে স্মৃতি-বাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যারা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক প্রতি পলকের রাগিণী॥
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ বহি' নিমেষের কাহিনী॥

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে র'বে যুঝিতে তারি গহ্বর পুরাতে।
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস ফুরাতে॥

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি, ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি॥

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর 'পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা।

যথা-স্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান।
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায় বিদ্যেরত্ন পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,—
চলছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক সদাই দিবারাত্র—
পাত্রাধার কি তৈল, কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র ;
পুঁথি-পত্র মেলাই আছে মোহধ্বান্ত-নাশন
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে পেতে চাস কি আসন।
গান তা শুনি' গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে ॥
কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান।
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে আছেন ভাগ্যমন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি' পঞ্চহাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা ;
অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে যত্ন পুরা মাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী সেথায় করবি যাত্রা ?
গান তা শুনি' কর্ণমূলে
মর্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান।
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে এক্‌জামিনের পড়ায়।
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন্ দিকে-যে গড়ায়।
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা,
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা ;—
সেইখানেতে ছেঁড়া-ছড়া এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল, করবি কি তুই খেলা।
গান তা শুনে মৌন মুখে
রহে দ্বিধার ভরে,—
যাব-যাব করে॥
কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ।
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী-বধূ যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে, ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে।
বালিস-তলে বইটি চাপা, টানিয়া লয় তারে—
পাতাগুলিন ছেঁড়া-খোঁড়া শিশুর অত্যাচারে।
কাজল-আঁকা সিঁদুর মাখা চুলের গন্ধে ভরা,
শয্যা-প্রান্তে ছিন্ন বেশে চাস কি যেতে ত্বরা।
বুকের 'পরে নিঃশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান॥
কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ।

যেথায় সুখে তরুণ যুবক পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায় ;
পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়, পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে
বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে।
হঠাৎ উঠে উচ্ছুসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে সভা বসত সন্ধ্যা হোলে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন মনে দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি'।
জীবনতরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে ॥
চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি থাকত নাকো ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইকো মৃত্যু জরা।
ছ'টা ঋতু পূর্ণ ক'রে ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্তা তাহার রৈত কাব্যে গাঁথা।
বিরহ-দুখ দীর্ঘ হোত, তপ্ত অশ্রু নদীর মতো,
মন্দগতি চলত রচি' দীর্ঘ করুণ গাথা।

আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো একটুমাত্র ত্বরা ॥
অশোককুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হোত ফুল্ল, প্রিয়ার মুখের মদিরাতে।
প্রিয়সখীর নামগুলি সব ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংস-কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা, কোনো নামটি চিত্রলিখা
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী ঝংকারিত কত।
আসত তারা কুঞ্জবনে চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক শাখা উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে ॥
কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরুগন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে ॥
কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায় বক্ষ রৈত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে চেয়ে রইত বঁধুর আশে
একটি ক'রে পূজার পুষ্পে দিন গনিত ব'সে।
বক্ষে তুলি' বীণাখানি গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে পড়ত খ'সে খ'সে।
মিলন-রাতে বাজত পায়ে নূপুর দুটি বাঁকা,
কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায় বক্ষ রৈত ঢাকা ॥
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে,
নাচিয়ে দিত ময়ূরটিরে কঙ্কণ-ঝংকারে।

কপোতটিরে লয়ে বুকে সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্মকোরক বহি'।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী কথা কৈত সৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধরে, "হলা পিয় সহি।"
জল সেচিত আলবালে তরুণ সহকারে।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে॥
নবরত্নের সভার মাঝে রৈতাম একটি টেরে,
দূর হইতে গড় করিতাম দিঙ্‌নাগাচার্য্যেরে।
আশা করি নামটা হোত ওরি মধ্যে ভদ্রমতো;
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত কিম্বা বসুভূতি।
স্রগ্ধরা কি মালিনীতে বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি' দুটি চারটি ছোটোখাটো পুঁথি।
ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি শ্লোক রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে রৈতাম একটি টেরে॥
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্ মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায় যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।
ছল করে তার বাধত আঁচল সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে॥
হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ, ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা মালবিকার দল।

কোন্ স্বরগে নিয়ে গেল বরমাল্যের থাল।
হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল ॥
যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন সে সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরি দুঃখে আমায় করছে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে, তেমনি বকুল ফোটে গাছে
যদিও সে পায় না নারীর মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক ছায়ে অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু তেমনি লাগে মিঠা।
অনেকদিকেই যায় যে পাওয়া অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নইকো কোথাও সে সব বরাঙ্গনা ॥
এখন যাঁরা বর্তমানে আছেন মর্ত্যলোকে,
ভালোই লাগত তাঁদের ছবি কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা, চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।
মরব না ভাই নিপুণিকা চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবে অন্যনামে আছেন মর্ত্যলোকে ॥
আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদু মন্দ,
আমার কালের কণামাত্র পাননি মহাকবি।
দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি এই আধুনিক বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে তোমার তরুণ আঁখির প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা।

যাত্রী

আছে, আছে স্থান।
একা তুমি, তোমার শুধু একটি আঁটি ধান।
না হয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি এমন কিছু নয় সে বেশি,
না হয় কিছু ভারি হবে আমার তরীখান,
তাই বলে কি ফিরবে তুমি,—আছে, আছে স্থান॥

এসো, এসো নায়ে।
ধুলা যদি থাকে কিছু থাক্ না ধুলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা, চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ বরন বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই এসো, এসো নায়ে॥

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো খনেক তরে বসবে আমার তরী 'পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে মানবে না কেউ মানা।
এলে যদি তুমিও এসো, যাত্রী আছে নানা॥

কোথা তোমার স্থান।
কোন গোলাতে রাখতে যাবে একটি আঁটি ধান।
বলতে যদি না চাও, তবে শুনে আমার কী ফল হবে,
ভাবব বসে খেয়া যখন করব অবসান—
কোন পাড়াতে যাবে তুমি, কোথা তোমার স্থান॥

(* অগ্রহায়ণ, ১৩০৫) —ক্ষণিকা।

অতিথি

ঐ শোনো গো অতিথ বুঝি আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ।
শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা-সাঁঝ।
পায়ে পায়ে বাজিয়োনাকো মল,
ছুটোনাকো চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ।
ঐ শোনো গো অতিথ এল আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ॥

২

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়।
মিছে ভয়।
আঁধার কিছু নাইকো আঙিনাতে,
আজকে আকাশ ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আলোয় আলোময়।

না হয় তুমি মাথায় ঘোমটা টানি'
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি,
যদি শঙ্কা হয়।
নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়॥

৩

না হয় কথা ক'য়ো না তার সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।
প্রশ্ন যদি শুধায় কোনো কিছু
নীরব থেকো মুখটি করে নিচু
নম্র দু-নয়নে।
কাঁকন যেন ঝংকারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আনবে যবে সাথে
অতিথি সজ্জনে।
না হয় কথা ক'য়ো না তার সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে॥

৪

ওগো বধূ, হয়নি তোমার কাজ?
গৃহ-কাজ?
ঐ শোনো কে অতিথ এল আজ,
এল আজ।

সাজাওনি কি পূজারতির ডালা।
এখনো কি হয়নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ।
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে'
সিঁদুর-বিন্দু আঁকো নাই কি শিরে।
হয়নি সন্ধ্যাসাজ?
ওগো বধূ হয়নি তোমার কাজ?
গৃহ-কাজ?
ঐ শোনো কে অতিথ এল আজ
এল আজ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা।

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউষের খেত জলে ভর-ভর,
কালি-মাখা মেঘে ও-পারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি' রে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে

২

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি।
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে॥

৩

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে?
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু-কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর-বেগে জলে পড়ি' জল
ছলছল উঠে বাজি' রে॥
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥

৪

ওগো আজ তোরা যাসনে গো তোরা
যাসনে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে॥

ঝরঝর-ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ্ চাহি' রে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা।

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ ;
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে ॥

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,

কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে ॥

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে ॥

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে।
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি'।
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে।
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে।

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে
শ্যামল বসনে।

সুদূর গগনে কাহারে সে চায়।
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়।
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে।

ওগো নির্জনে বকুল-শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে।
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে।

বিকচ-কেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তা'র তরণী
তরুণ তরণী।
রাশি রাশি তুলি' শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরান-হরণী।
বিকচ-কেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী॥

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

ঘন মেঘে আঁধার হোলো দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।

আকাশ পানে হানি' যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কি না চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

এমনি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এমনি ক'রে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়না পাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।

মাথার 'পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা।

আবির্ভাব

বহুদিন হোলো কোন ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরানে যে-গান বাজাবে
সে-গান তোমার করো সায়।
আজি জলভরা বরষায় ॥

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘন নীল গুণ্ঠন তব,
চল-চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক আভরণ ॥

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
মুয়ে মুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি' বাজে কিঙ্কিনী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিঃশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল॥

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর উপকূল।
চরণে জড়ায়ে বনফুল॥

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে ব'সে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে-গানের সুর
এ ছোট বীণার ক্ষীণ তার;
এ নহে তোমার উপহার॥

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি
দূরে করি' দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন।
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ।
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ।
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন;
এ কী রূপে দিলে দরশন॥

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজন-হীন পরমাদ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
বন-বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ॥
আসো নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়;
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি' যে-গান বাজাবে
সে-গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায়॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা।

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি',
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণডালা ধরি'।
সদা তোমার ঘরের মাঝে একটি নীরব শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গল গীত উঠে মধুর স্বরে॥

রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরণমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা   পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি হাসে চোখের পরে॥

তোমার নাহি শীতবসন্ত, জরা কি যৌবন,
সর্বঋতু সর্বকালে তোমার সিংহাসন।
নিভেনাকো প্রদীপ তব,   পুষ্প তোমার নিত্যনব,
অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি' চির বিরাজ করে॥

নদীর মতো এসেছিলে গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগরপানে চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা   সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল তীর্থসলিল ঝরে॥

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে   কত অধীর সমীরণে,
কত যে ফুল, কত আকুল মুকুল খ'সে পড়ে।

(১৩০৬) —— —ক্ষণিকা।

কুটুম্বিতা

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই ব'লে ডাকো যদি দেব গলা টিপে'।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,—
কেরোসিন বলি উঠে—এসো মোর দাদা।

—কণিকা।

অসম্ভব ভালো

যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন স্বর্গপুরী তুমি ক'রে থাকো আলো।
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।

—কণিকা।

অকৃতজ্ঞ

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

কণিকা।

উপকার-দম্ভ

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি' শির—
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

—কণিকা

একই পথ

দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।

—কণিকা।

ফুল ও ফল

ফুল কহে ফুকারিয়া ফল, ওরে ফল,
কত দূরে রয়েছিস বল্ মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয় কেন হাঁকাহাঁকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।

—কণিকা।

মোহ

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

—কণিকা।

চির-নবীনতা

দিনান্তের মুখ চুম্বি' রাত্রি ধীরে কয়,—
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়,
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে ক'রে দিই প্রত্যহ নবীন।

—কণিকা।

কর্তব্য গ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য—কহে সন্ধ্যা রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

—কণিকা।

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব,—হাসে অন্তর্যামী।

—কণিকা।

ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

—কণিকা।

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম—চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল ফিরে দেখো।—দেখিলাম থামি'
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

—কণিকা।

প্রশ্নের অতীত

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা।
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর।
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর।

—কণিকা।

এক পরিণাম

শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম তারা।
তারা কহে, আমারো তো হোলো কাজ সারা;—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি।

—কণিকা।

মুক্তি

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

(১৩০৭) —নৈবেদ্য।

স্তব্ধতা

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।
জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে,
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি'। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত। এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল,
তোমার আসন ঘেরি' অনন্ত কল্লোল॥

(১৩০৭) —নৈবেদ্য।

ন্যায়দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে-গুরু-সম্মান তব, সে-দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হোতে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে॥

(* বৈশাখ, ১৩০৮) —নৈবেদ্য।

প্রাণ

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে

নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে,
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন॥

(* বৈশাখ, ১৩০৮) —নৈবেদ্য

যুগান্তর

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি'

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি॥

(*—বৈশাখ, ১৩০৮) —নৈবেদ্য।

প্রার্থনা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি', পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

(* বৈশাখ, ১৩০৮) —নৈবেদ্য

অপরূপ

তোমায় চিনি ব'লে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে ;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে।"—
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "কী জানি, কী জানি"।
তুমি শুনে হাসো, তারা দুষে মোরে
কী দোষে॥

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারিনি আপন প্রাণে।
কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে—
"যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি।"
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "অর্থ কী জানি।"
তারা হেসে যায়, তুমি হাসো ব'সে
মুচুকি'॥

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বলো তো
কেমনে বলি।
খনে খনে তুমি উঁকি মারি' চাও,
খনে খনে যাও ছলি'।
জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি',
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি',
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে॥

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে।
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধ'রে।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি।
কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো,
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি'॥

(১৩০৮) —উৎসর্গ।

পাগল

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ-সম।
ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ-বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।
বাহু মেলি তা'রে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম,
উতলা পাগল-সম।
যারে বাঁধি ধ'রে, তা'র মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না॥

(১৩০৮ ?) —উৎসর্গ।

সুদূর

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায় আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে-কথা-যে যাই পাসরি'॥

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে' তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ,
সে-কথা-যে যাই পাসরি'॥

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়,
তরু-মর্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি'।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে-কথা-যে যাই পাসরি'॥

(১৩০৮ ?) —উৎসর্গ

কুঁড়ি

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায়, বেলা যায় গো,
ফাগুনের বেলা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা—

কুসুম ফুটিবে বাঁধন টুটিবে,
পুরিবে সকল কামনা।
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না॥

কুঁড়ির ভিতর ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কী জানি কিসের কাজে।
কহিছে সে— হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা—
দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না॥

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে ব'সে—
ভাবিছে উদাস পারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থ-হারা।
কহিছে সে—হায় হায়,
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা—

যে-শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি ;
জনম ব্যর্থ যাবে না ॥

(* আষাঢ়, ১৩০৯) —উৎসর্গ।

প্রবাসী

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে-দুয়ারে যাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া ॥

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে,

তারা নিশি-দিশি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে॥

তৃণে পুলকিত যে-মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে-ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে-দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে॥

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।
যে-ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি ;
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে॥

এ সাত-মহলা ভবনে আমার
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা-যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,—
দূরে এসে চাই ঘর বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে।
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে॥

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা ;
ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা ;
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল
জীব-সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা ;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্ত-বিহীন আপনা॥

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে
প্রতি-কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি তুই আমারে কি চাস,
মোর তরে জল দু-হাত বাড়াস ?

নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারেবারে
সবাই আমারে টানিছে॥

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরনী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বলো কারে;
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী॥

(* বৈশাখ, ১৩০৮) —উৎসর্গ।

বিশ্বদেব

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,

নীরব আশিস-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি' চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ-'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে ॥

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়-গগনে
মুখ আপনার ঢাকি' আবরণে
হিরণ-কিরণে গাঁথা,—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি' কাননের বিহঙ্গ-গীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রী-গাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে ॥

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গল-শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণ-হুংকার
ভেদি' বণিকের ধন-ঝংকার
মহাকাশ-তলে উঠে ওংকার
কোনো বাধা নাহি মানি'।
ভারতের শ্বেত হৃদি-শতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে
সংগীত-তানে শূন্যে উতলে
অপূর্ব মহাবাণী।
নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল-পানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে॥

(* পৌষ, ১৩০৯) —উৎসর্গ।

আবর্তন

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া॥

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হোতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

(* পৌষ, ১৩০৯) —উৎসর্গ

অতীত

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন চেয়ে বসে রও।
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগর-তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষা নীরব তাহার,—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন, তুমি তারে কোথা লও।
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও॥
কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও,—
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে,

মুখর দিনের চপলতা মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও॥
কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তা'রে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও॥

(১৩০৯ ?) —উৎসর্গ।

মরণ-দোলা

চিরকাল এ কী লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।

সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল এ কী লীলা গো
অনন্ত কলরোল॥
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী-যে করো কে বা জানে।
কোথা বঁসে আছ একেলা।
সব রবি শশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে করো এ খেলা।
খুলে দাও ক্ষণ-তরে,
ঢাকা দাও ক্ষণ-পরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কী ধন
কে লইল বুঝি হ'রে।
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে-কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে॥
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া শুধু আসা।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে তো যেমন যা' ছিল,
হারায়নি কিছু ফুরোয়নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।
বহি' সব সুখ দুখ,
এ ভুবন হাসি-মুখ,

তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা॥

(* পৌষ, ১৩০৯) —উৎসর্গ।

মরণ

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ;
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ।
যবে সন্ধ্যা-বেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বসো অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না-যে কী-যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

হায় এমনি ক'রে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি' হৃদিতলে অবতরণ।

তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে।
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিংকিণী-রনরনিতে।
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ।
আমি বুঝি না-যে কেন আসো-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥
কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহ-ভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ।
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি' বাঁধা হবে না।
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ব'বে না।
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ।
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কত শত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি' রহি' গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি' জটাজাল
যত ভুজঙ্গ-দল তরজে।

তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥
শুনি' শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি' কর,
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

তুমি চুরি করি' কেন এসো চোর
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
শুধু নীরবে কখন্ নিশি ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরন।
তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে,
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি' হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে কারেয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরূক নয়নে,—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি' প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

আমি যাব যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি' আঁধারের অনুসরণ ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি' মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

(* ভাদ্র ১৩০৯) —উৎসর্গ ।

———

হিমাদ্রি

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়-পানে
দুর্গম দুরুহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে।
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি' আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী-ধারা।

হে গিরি, যৌবন তব যে-দুর্দম অগ্নিতাপ-বেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে-তাপ হারায়ে গেছে, সে-প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমা-বিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।

(* শ্রাবণ, ১৩১০) —উৎসর্গ।

মৃত্যু-মাধুরী

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায় সূর্যাস্তের বরন-চাতুরী।

জীবনের দিকচক্র-সীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা,
অশ্রু-ধৌত হৃদয়-আকাশে দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী ॥

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হতে
প্রতিক্ষণে মর্ত্ত্যের আলোতে-
পাঠাইছ তব চিত্তখানি মৌনপ্রেমে সজল-কোমল।
মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
বসে আছ বাতায়ন-'পরে,
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী মরণেরে করেছ মঙ্গল ॥

তুমি মোর জীবন মরণ বাঁধিয়াছ দু-টি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি' অনাবৃত
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয় নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া।
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি',
জন্ম-মরণের মাঝখানে নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন-মরণ বাঁধিয়াছ দু-টি বাহু দিয়া ॥

(৭ মাঘ, ১৩০৯) —স্মরণ।

চিঠি

দেখিলাম খান-কয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা ক-টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি' রেখেছিলে ঘরে।
যে-প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবি চন্দ্র তারা
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই ক-টি তুচ্ছ বস্তু চুরি ক'রে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে।
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে।
জগতের কারো নয় তবু তারা আছে।
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ।

(* মাঘ, ১৩০৯) —স্মরণ।

শিশুলীলা

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারাবেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা॥

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা ॥
বিপুল নীল সলিল 'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী,
আপন হাতে হেলায় গড়ি'
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা ॥

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে ;
বণিক ধায় তরণী বেয়ে ,
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা ॥

ফেনিয়ে উঠে' সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে
দোলনা ধরি' যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা ॥

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে ;
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা॥

(১৩১০) —শিশু।

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ছিলি আমার পুতুল খেলায়, ভোরে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

আমার চিরকালের আশায়, আমার সকল ভালবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে—
পুরানো এই মোদের ঘরে গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কতকাল যে লুকিয়েছিলি কে জানে।

যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সব দেবতার আদরের ধন, নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই প্রভাতের স্বপ্ন হতে এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি'।

নির্নিমেষে তোমায় হেরে তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি' মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখতে-যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু-দুটির আড়ালে॥"

(* ১৩১০) —শিশু।

কেন মধুর

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন-যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে জলে রং উঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে॥

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে॥

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি, স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারি কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে॥

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি'—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি।

(* ১৩১০) —শিশু।

ছুটির দিনে

ঐ দেখো মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এল আলো;
আজকে আমার ছুটোছুটি লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন অনেক হোলো বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল ফেলে এলেম খেলা।
আজকে আমার ছুটি, আমার শনিবারের ছুটি;
কাজ যা আছে সব রেখে আয় মা, তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে ব'স্ এই হেথা চৌকাঠ;
বল্ আমারে কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ॥

ঐ দেখো মা বর্ষা এল ঘনঘটায় ঘিরে',
বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে আকাশ চিরে চিরে।
দেবতা যখন ডেকে ওঠে,—থরথরিয়ে কেঁপে
ভয় করতেই ভালবাসি তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুনতে ভালবাসি ব'সে কোণের ঘরে।
ঐ দেখো মা জানলা দিয়ে আসে জলের ছাঁট,
বল্ গো আমায় কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ॥

কোন্ সাগরের তীরে মাগো কোন্ পাহাড়ের পারে,
কোন্ রাজাদের দেশে মাগো কোন্ নদীটির ধারে।
কোনোখানে আল বাঁধা তার নাই ডাহিনে বাঁয়ে?
পথ দিয়ে তার সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে?
সারাদিন কি ধু ধু করে শুক্‌নো ঘাসের জমি।
একটি গাছে থাকে শুধু ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি?
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ানি যায় না নিয়ে কাঠ?
বল্ গো আমায় কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ॥

এমনিতরো মেঘ করেছে সারা আকাশ ব্যেপে;
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমতির মালাটি তার বুকের 'পরে নাচে,
রাজকন্যা কোথায় আছে খোঁজ পেলে কার কাছে।
মেঘে যখন ঝিলিক মারে আকাশের এক কোণে।
দুয়োরানী-মায়ের কথা পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল-ঘরে দিচ্ছে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে-যে কোন্ তেপান্তরের মাঠ।

ঐ দেখো মা গাঁয়ের পথে লোক নেইকো মোটে ;
রাখাল-ছেলে সকাল ক'রে ফিরেছে আজ গোঠে।
আজকে দেখো রাত হোলো-যে দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা বসে আছে দাওয়ায় মাদুর পেতে।
আজকে আমি লুকিয়েছি মা, পুঁথি-পত্তর যত,
পড়ার কথা আজ বোলো না, যখন বাবার মতো—
বড় হব, তখন আমি পড়ব প্রথম পাঠ,
আজ বলো মা কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ ॥

(* ১৩১০)　　　　—শিশু।

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই ,
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা ব'লে,
বলব আমি—নাই সে খোকা নাই ;
মা গো যাই।

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা তোর বুকে বয়ে,
ধরতে আমায় পারবিনে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা ঢেউ
জানতে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।

বাদলা যখন পড়বে ঝ'রে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে।

খোকার লাগি' তুমি মা গো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হয়ে বলব তোমায়, "ঘুমো";
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো॥

স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে,
দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে॥

পূজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে—খোকা নেই-যে ঘরের মাঝে।
আমি তখন বাঁশির স্থরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে॥

পূজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।"
বলিস, খোকা সে কি হারায়।
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে ॥

(* ১৩১০) —শিশু

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার-মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘর-ছাড়া,
সন্ধ্যা আসে, দিন-যে চলে যায়।
ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায় ॥
সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও-পার হতে এক টানা
একটি দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন ক'রে চিনব ও রে ওদের মাঝে কোনখানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।

অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁসে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়,
ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি' হেথায় পাড়ি ধরবে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়।
ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায় ॥

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর-পানে
পারে যারা যাবার, গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফল্ল না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁজের আলো জল্ল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায় ॥

(* আষাঢ়, ১৩১২) —খেয়া

শুভক্ষণ

১

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কী মতে।
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস।
মা গো, কী হোলো তোমার, অবাক-নয়নে
মুখ পানে কেন চাস।

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে,
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে;—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি' না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে।

২

ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি' মোর

ঘরের সমুখ পথে,

প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার

স্বর্ণ-শিখর রথে।

ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে

নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,

ছিঁড়ি' মণিহার ফেলেছি তাহার

পথের ধুলার পরে।

মা গো কী হোলো তোমার, অবাক-নয়নে

চাহিস কিসের তরে।

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে

রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,

চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে

পড়ে আছে শুধু আঁকা।

আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ

ধুলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি' মোর

ঘরের সমুখ পথে—

মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া

রহিব বলো কী মতে।

(* অগ্রহায়ণ, ১৩১২) —খেয়া

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হোলো সাঙ্গ হোলো কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম আসবে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত রুদ্ধ হোলো রাতের মতো,
দুয়েক জনে বলেছিল "আসবে মহারাজ।"
আমরা হেসে বলেছিলেম "আসবে না কেউ আজ॥"

দ্বারে যেন আঘাত হোলো শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম বাতাস বুঝি হবে।
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে শুয়েছিলেম আলসভরে,
দুয়েক জনে বলেছিল "দূত এল বা তবে।"
আমরা হেসে বলেছিলেম "বাতাস বুঝি হবে॥"

নিশীথ রাতে শোনা গেল কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি' কাঁপল ধরা থরহরি,
দুয়েক জনে বলেছিল "চাকার ঝনঝনি।"
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা "মেঘের গরজনি॥"

তখনো রাত আঁধার আছে, বেজে উঠল ভেরী,
কে ফুকারে—"জাগো সবাই, আর কোরো না দেরি।"
বক্ষ-'পরে দু-হাত চেপে আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—"রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি "আর তবে নয় দেরি॥"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য, কোথায় আয়োজন ;
রাজা আমার দেশে এল কোথায় সিংহাসন।
হায়রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা ;
দুয়েক জনে কহে কানে—"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত-করে শূন্য ঘরে করো অভ্যর্থন ॥"

ওরে দুয়ার খুলে দে রে—বাজা শঙ্খ বাজা ;
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে, বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখ রাতের রাজা ॥

(* আশ্বিন, ১৩১২) —খেয়া

দান

ভেবেছিলেম চেয়ে নেব—চাইনি সাহস করে—
সন্ধ্যেবেলায় যে-মালাটি গলায় ছিলে প'রে—
আমি চাইনি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হোলে যখন পারে যাবে চলে,
ছিন্নমালা শয্যাতলে রইবে বুঝি পড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো এসেছিলেম ভোরে—
তবু চাইনি সাহস করে ॥

এ তো মালা নয় গো, এ-যে তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র হেন ভারি—
এ-যে তোমার তরবারি।

তরুণ আলো জানলা বেয়ে পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে "কী পেলি তুই নারী।"
নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি,
এ-যে ভীষণ তরবারি ॥

তাই তো আমি ভাবি বসে এ কী তোমার দান।
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি নাই-যে হেন স্থান।
ওগো এ কী তোমার দান।
শক্তিহীনা মরি লাজে এ ভূষণ কি আমায় সাজে।
রাখতে গেলে বুকের মাঝে ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান ॥

আজকে হতে জগৎ-মাঝে ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয় ॥

তোমার লাগি' অঙ্গ ভরি' করব না আর সাজ।
নাই বা তুমি ফিরে এলে ওগো হৃদয়রাজ;
আমি করব না আর সাজ।
ধুলায় বসে তোমার তরে কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে পরে মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায় সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ ॥

(* অগ্রহায়ণ, ১৩১২) —খেয়া।

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই-যে নবীনা বুদ্ধি-বিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে-বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

জানে না করিতে সাজ;
কেশ বেশ তার হোলে একাকার
মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধুলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরনের কাজ।
জানে না করিতে সাজ॥

কহে এরে গুরুজনে
"ও-যে তোর পতি, ও তোর দেবতা
ভীত হয়ে তাহা শোনে।

কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি' কভু মনে পড়ে তার—
"পালিব পরান-পণে
যাহা কহে গুরুজনে ॥"

বাসকশয়ন-'পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভখন বৃথা চলি' যায়,
যে-হার তাহারে পরালে, সে-হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন-'পরে ॥

শুধু দুর্দিনে ঝড়ে
—দশ দিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধূলা কোথা পড়ে থাকে তার,
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে ॥

মোরা মনে করি ভয়,
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।

তুমি আপনার মনে মনে হাসো,
এই দেখিতেই বুঝি ভালবাসো,
খেলাঘর-দ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কী-যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়॥

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়ন-তলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি' মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে॥

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জানো জানো তুমি—ধুলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

* মাঘ, ১৩১২) —খেয়া।

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি এসে শুধাই তারে ডেকে
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে॥

ভরা সাঁজে আঁধার হয়ে এলে
আমি এসে শুধাই ডেকে তারে
"তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে,
সে কহিল "আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।"
চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে॥

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
শুধাই আমি তাহার কাছে গিয়ে
"ওগো তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,
সে কহিল, "এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।"
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে ॥

—খেয়া

কৃপণ

ভিক্ষা ক'রে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে
তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম লাগতেছিল চক্ষে মম
কী বিচিত্র শোভা তোমার কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম এ কোন্ মহারাজ ॥

শুভক্ষণে রাত পোহাল ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হোতে নাহি হোতে কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধন ধান্য ছড়াবে দুইধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে ॥

সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে,
আমার মুখ পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা;
হেনকালে কিসের লাগি' তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" ব'লে বাড়িয়ে দিলে হাত ॥

এ কী কথা রাজাধিরাজ, "আমায় দাও গো কিছু।"
শুনে ক্ষণকালের তরে রৈনু মাথা নিচু।
তোমার কী বা অভাব আছে ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে।
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে একটি ছোটো কণা ॥

পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি—এ কী,
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভ'রে—
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য ক'রে ॥

(১৩১২ ?) —খেয়া।

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত করিস বোঁটাতে,
তোরা কেউ পারবি নে গো পারবি নে ফুল ফোটাতে ॥

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান করতে পারিস তারে,
ছিঁড়তে পারিস দলগুলি তার ধুলায় পারিস লোটাতে,
তোদের বিষম গণ্ডগোলে
যদিই বা সে মুখটি খোলে,
ধরবে না রঙ—পারবে না তার গন্ধটুকু ছোটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো পারবি নে ফুল ফোটাতে॥

যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে॥

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে হাওয়ায় থাকে লোটাতে।
রঙ-যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মতো,
যেন কারে আনতে ডেকে গন্ধ থাকে ছোটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে॥

(১৩১২ ?) —খেয়া

"সব-পেয়েছি"র দেশ

সব-পেয়েছির দেশে কারো নাই রে কোঠাবাড়ি,
দুয়ার খোলা পড়ে আছে, কোথায় গেল দ্বারী।
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায় হস্তিশালায় হাতি,
স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে জ্বালায় না কেউ বাতি।

রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া সব-পেয়েছির দেশে।
পথের ধারে ঘাস উঠেছে গাছের ছায়াতলে,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা পাশ দিয়ে তার চলে।
কুটীরেতে বেড়ার 'পরে দোলে ঝুমকো-লতা ;
সকাল হতে মৌমাছিদের ব্যস্ত ব্যাকুলতা।
ভোরের বেলা পথিকেরা কী কাজে যায় হেসে—
সাঁঝে ফেরে বিনা-বেতন সব-পেয়েছির দেশে।

আঙিনাতে দুপুর বেলা মৃদুকরুণ গেয়ে
বকুলতলার ছায়ায় ব'সে চরকা কাটে মেয়ে।
মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি, হঠাৎ আসে প্রাণে।
নীল আকাশের হৃদয়খানি সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায় সব-পেয়েছির দেশে।

সদাগরের নৌকা যত চলে নদীর 'পরে—
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ কেনাবেচার তরে।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা কাঁপিয়ে চলে পথ ;
হেথায় কভু নাহি থামে মহারাজের রথ।
এক রজনীর তরে হেথা দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই সব-পেয়েছির দেশে

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি, নাইকো হাটে গোল,
ওরে কবি, এইখানে তোর কুটীরখানি তোল্ ;

ফেল্ রে ধুয়ে পায়ের ধুলো, নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে ব'স্‌রে হেথায় সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে সব-পেয়েছির দেশে।

(৬ শ্রাবণ, ১৩১৩) —খেয়া।

ভারত-তীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হোলো হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

রণধারা বাহি' জয় গান গাহি'
উন্মাদ কলরবে
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি'।
তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে-আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্তশিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

(১৮ আষাঢ়, ১৩১৭) গীতাঞ্জলি।

অপমান

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হোতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে-যে নিচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মান-ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করো না নমস্কার।
তবু নত করি' আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান।
অপমানে হোতে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি' দিল তোমার জাতির অহংকারে।

সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান ॥

(২০ আষাঢ়, ১৩১৭) —গীতাঞ্জলি ।

আত্মবিক্রয়

"কে নিবি গো কিনে' আমায়, কে নিবি গো কিনে'।"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি ক'রে হায়, আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার 'পরে বোঝা আমার বিষম হোলো দায়।
কেউ বা আসে কেউ বা হাসে, কেউবা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট মাথে অস্ত্র হাতে রাজা এল রথে,
বললে হাতে ধ'রে, "তোমায়
কিনব আমি জোরে ;"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি ক'রে।
মুকুট মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চ'ড়ে।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বললে
"কিনব দিয়ে সোনা।"

উজাড় ক'রে দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বললে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব আমি হেসে।"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে;
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বন-ছায়ার দেশে॥

সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে', বললে
"অমনি নেব কিনে'।"
বোঝা আমার খালাস হোলো তখনি সেই দিনে
খেলার সুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে॥

(আষাঢ়, ১৩১৯) — গীতিমাল্য

যাত্রাশেষ

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে'।
উদয়াচলের সে-তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে'॥

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমায়েছে নিঃস্পন্দ
তারা-দীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে॥

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা ;
অঙ্গুলি তুলি' তারাগুলি অনিমেষে
মা ভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া,
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে'
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা॥

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি'।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখি।
কত প্রভাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায়-বেলায় আজিও রহিল বাকি॥

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে',
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে,
যে মণি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,

ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে ॥

(২ কার্তিক, ১৩২১) —গীতালি

নবীন

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত-আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়।
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ-যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥

বাহির পানে তাকায় না-যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে'
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা,
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা॥

শিকল-দেবীর ঐ-যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত আয় রে আমার কাঁচা॥

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে,
বিবাগী কর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত আয় রে আমার কাঁচা॥

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী।
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা॥

(১৫ বৈশাখ, ১৩২১) —বলাকা

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে, কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে, এ কী রে দুর্দৈব।
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্ না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে আয় না রে নিঃশঙ্ক,
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে ঐ-যে অভয় শঙ্খ॥

চলেছিলেম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত তোমার মহাশঙ্খ॥

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা। এই কি আমার সন্ধ্যা।
গাঁথব রক্ত-জবার মালা। হায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি',
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি নীরব তব শঙ্খ॥

যৌবনেরি পরশমণি করাও তবে স্পর্শ;
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি' দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধ'রে তোমার জয়শঙ্খ॥

জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারা সম বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে;
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে সুপ্তির পালঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রবো,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি লব অভয় তব শঙ্খ॥

(১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) —বলাকা

পাড়ি

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ-যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি' পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তা'রা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূলছাড়া মোর নেয়ে।
এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে।
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে।

কোন্ ঘাটে-যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথ-হারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে।
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে॥

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিরাগী মোর নেয়ে।
নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন্ রতনের বোঝা
আসছে তরী বেয়ে।
নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে॥

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হোলো নেয়ে।
তারি লাগি' পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি',
দীপের আলো বাদল বায়ে কাঁপছে থাকি' থাকি'
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জানো না তাহারি নাম ডাকি'
ঐ-যে আসে নেয়ে॥

অনেক দেরি হয়ে গেছে বাহির হোলো কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয়নি প্রভাত অনেক দেরি হবে
আসতে তরী বেয়ে।
বাজবে না কো তুরী ভেরী, জানবে না কো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য-যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে॥

(৫ ভাদ্র, ১৩২১) —বলাকা

ছবি

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা ক'রে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন,
কেন রাত্রিদিন

সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে।
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি'
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি'
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তা'র পত্রলিখা দেয় লিখে'
বসন্তের মিলন-উষায়
এই ধূলি এও সত্য হায়।
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন,
এরা-যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে-যে আজ হোলো কত কাল।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।

মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি' রসের মুরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।
একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি'।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে;
পথের দু-ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি।
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি সে-আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হোত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে'।
তুমি-যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা।
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি' দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ-যে ঠাঁই;

আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, তুমি নও ছবি।

(৩ কার্তিক, ১৩২১) —বলাকা।

শা-জাহান

এ-কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজ-শক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন;
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ—
এই তব মনে ছিল আশ।

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা,
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।
হায় ওরে মানব হৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময়-যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি।
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি
হায়রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-প্রান্তে ফেলে যেতে হয়—
নাই নাই, নাই-যে সময়।

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না-যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে
জ্যোৎস্না-রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া

প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে
তোমার সৌন্দর্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে;
তব সৈন্যদল—
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল—
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্নপ্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,
তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া
তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া,

যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা—কে বলে-যে ভোলো নাই।
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার।
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির,
ধরার ধুলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।—
জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি-তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে'
সে-যে যায় ছুটে'
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে;
সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে

জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি-যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা, ধুলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যত দূর চাই
নাই নাই সে-পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

(কার্তিক, ১৩২১) —বলাকা।

চঞ্চলা

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে' ঘুরে' মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো।
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ-যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।

অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
সর্বনাশা প্রেম তা'র, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে-অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;
দুলে' উঠে বিদ্যুতের দুল;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;
বারংবার ঝ'রে ঝ'রে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও
কুড়ায়ে লও না কিছু, করো না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

যে-মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই;
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'

পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি',
তখনি চমকি'
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম-মূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকার-মুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি;
বক্ষ তোর উঠে রনরনি'।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,

কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে,
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাসনে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

(৩ পৌষ, ১৩২১) —বলাকা।

দান

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান।
সে কি প্রভাতের গান।

প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির ’পরে,
অবসন্ন গান
হয় অবসান ॥
হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে।
কী তোমারে দিব আনি’,
সে কি সন্ধ্যাদীপখানি।
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে কি লইবে জনতায়।
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায় ॥
কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার।
হোক ফুল, হোক না গলার হার
তার ভার
কেনই বা স’বে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা, ম্লান ছিন্ন হবে।
নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি’
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি’,
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি ॥
তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপনগন্ধে পুলকে চমকি’
দাঁড়াবে থমকি’,

পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি' থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার॥
আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান
হোক ফুল হোক তাহা গান॥

(১০ই পৌষ, ১৩২১) —বলাকা

প্রতিদান

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।
পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্ন-রসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি'।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিন-শেষে মিলনের রাতে।
তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।

সেই আবরণ দেখ্‌রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে-মুখখানি ॥

যৌবন রে, রয়েছ কোন তানের সাধনে।
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে।
তোমার বাণী দখিন্ হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তার চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয় মেঘে
ঝড়ের ঝংকারে ;
ঢেউয়ের 'পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে ॥

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে।
বয়সের এই মায়া-জালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্তি শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
অমর পুষ্প তব
আলোক পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য-নব ॥

যৌবন রে, তুই কি হবি ধুলায় লুণ্ঠিত।
আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানি-ভারে
রইবি কুণ্ঠিত।

প্রভাত-যে তার সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি',
আগুন আছে ঊর্ধ্বশিখা জ্বেলে
তোমার সে-যে কবি।
সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি॥

(৪ চৈত্র, ১৩২২) —বলাকা।

নববর্ষ

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী ;
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথ-হারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণিপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়-শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার—
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার;
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক্‌-হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর।

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি ;—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী,
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।

(৯ বৈশাখ, ১৩২৩) —বলাকা

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ঐ জানলা দুটো,—গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ;
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ ;
কত রকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ,
একটুমাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি।

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা।
এই জীবনটা ভালো, কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হোক-একটা-কিছু,
সে-কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন, ভেবে আগু-পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি-যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে-যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা ঐ-যে থামল যেন;
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন।

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ-বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম-দোলায় দোল,
হেঁকেছিল, "খোল্‌রে দুয়ার খোল্‌।"
সে-যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না-যে।

হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া ; হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত, হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা ; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে',
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যা-বেলায়
পাড়ায় কোথা শতরঞ্চ খেলায়।
থাক্ সে-কথা।
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রা-বিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হোত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হোত কাননে ফুল-ফোটা।
বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি ;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা।

আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন ডোর,
জনম মরণ এক হয়েছে ঐ-যে অকূল বিরাট মোহানায়,—
ঐ অতলে কোথায় মিলে' যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে-যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে-সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ-যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নিনিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

(* আষাঢ়, ১৩২৫) —পলাতকা।

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হোলো বড়ো ;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হোলো জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করল যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, "হাওয়া বদল করো।"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি।

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে
মোদের হোত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে ;
মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া,
চাপা হাসি টুকরো কথার নানান জোড়াতাড়া।
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশ ভরা সকল আলো ধ'রে
বর-বধূরে নিলে বরণ ক'রে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হোলো নতুন লোকে।
রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্‌সো খুলে'
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে'
কাগজ দিয়ে মুড়ে' --
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হোলে পরে
আনন্দ তার আপনারি ভার বইবে কেমন ক'রে।

সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চির প্রেমের স্রোতে,—
তাই যেন আজ দানে-ধ্যানে
ভরতে হবে সে-যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিন্নুর মনে জাগছে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার ;
কেউ কোথা নেই আর—
শ্বশুর ভাসুর সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে ;
সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি ;
তাড়াতাড়ি
নামতে হোলো, ছ-ঘণ্টাকাল থামতে হবে যাত্রি-শালায়,
মনে হোলো এ এক বিষম বালাই।
বিন্নু বললে, "কেন, এই তো বেশ।"
তার মনে আজ নেই-যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে-যে আজ করেছে চঞ্চলা,—
আনন্দে তাই এক হোলো তার পৌছনো আর চলা।
যাত্রি-শালার দুয়ার খুলে' আমায় বলে,—
"দেখো, দেখো, এক্কাগাড়ি কেমন চলে।
আর দেখেছ বাছুরটি ঐ আ ম'রে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ।
ঐ যেখানে দিঘির উঁচুপাড়ি,—
সিশুগাছের তলাটিতে, পাঁচিল-ঘেরা ছোটো বাড়ি
ঐ-যে রেলের কাছে,—
ইস্টেশনের বাবু থাকে।—আহা ওরা কেমন সুখে আছে।"

যাত্রি-ঘরে বিছানাটা নিলেম পেতে,
ব'লে দিলেম, "বিনু এবার চুপটি ক'রে ঘুমোও আরামেতে।"
প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু ক'রে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রি-ঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু—"কথা একটা আছে।"
ঘরে ঢুকে' দেখি কে-এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম ক'রে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।
বিনু বললে, "রুকমিনী ওর নাম।
ঐ-যে হোথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি,
তেরো-শ' কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হোলো,—স্বামী স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে
কী-এক নদীর ধারে"—
বাধা দিয়ে আমি বল্‌লেম হেসে,
"রুকমিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হোতেই গাড়ি পড়বে এসে,
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।"
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিনু বল্‌লে খেপে—
"কক্‌খনো না, বল্‌ব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে।
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।"

নভেল-পড়া-নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে।
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী-সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামী।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে তাই
পৈচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই ;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি ;
সে ভাবনাটা ভারি
রুক্‌মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার 'পরে ভার
কুলি-নারীর ভাবনা ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

অবাক কাণ্ড এ কী
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি।
জাতে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাৎ ওঁছা,
যাত্রি-ঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে।
এমন হোলে দেউলে হোতে ক-দিন বাকি থাকে।
"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে। আমি দেখছি মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই।"
বিনু বললে, "এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"
এই ব'লে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,—
আচ্ছা ক'রেই দিলেম তারে হেঁকে, —

"কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি।
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি
কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধ'রে
দু-টাকা তার হাতে দিয়ে দিলাম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার ক'রে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু-মাস যেই ফুরাল।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ-নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধুলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা কিছু আর ভুলি
শেষ দু-টি মাস অনন্তকাল মাথায় র'বে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্য-সিঁদুর সম।
এই দু-টি মাস সুধায় দিলে ভ'রে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"
ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দুই মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুকমিনীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।
বিনু-যে সেই দু-মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জানল না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে
"রুকমিনী-সে কোথায় আছে।"
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে,—
রুকমিনী কে তাই বা ক-জন জানে।

অনেক ভেবে "ঝামরু কুলির বৌ" বললেম যেই,
বললে সবে, "এখন তারা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাব তাকে।"
ইস্টেশনের বড়ো বাবু রেগে বলেন, "সে-খবর কে রাখে।"
টিকিট-বাবু বললে হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিংবা খশরুবাগে,
কিংবা আরাকানে।"
শুধাই যত, "ঠিকানা তার কেউ কি জানে।"—
তারা কেবল বিরক্ত হয় তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ।
কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন;
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই ছুটিমাস সুধায় দিলে ভরে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন ক'রে।
রয়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হোলো চিরস্থায়ী।

* জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) —পলাতকা।

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয় "মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে।—বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুণো সে বড়ো;—
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব না কো।"
বাপ বললে, "কান্না তোমার রাখো;

পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জানো না কি মস্ত কুলীন ও-যে।
সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাবো।
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব।"

মা বললে, "কেন ঐ-যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাই বা হোলো কুলীন,—
দেখতে যেমন তেমনি স্বভাবখানি,
পাস ক'রে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুকরো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা—ওরি সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হোলো ; ওকে যদি বলি আমি আজই
এক্খনি হয় রাজি।"
বাপ বললে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ।
ওরা আছে সমাজের সব তলায়,
বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়।
দেখতে শুনতে ভালো হোলেই পাত্র হোলো। রাধে
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।"

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতিপলের গোপন কাঁটায় হোলো রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা ;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে,
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে,—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।
তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য।
অন্তঃশীলা অশ্রু-নদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হোলো পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়-বেলায় মেয়েকে বাপ ব'লে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি'
"হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি।"

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু-মাস যেতেই ফলল কেমন করে—
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো।
অবশেষে হোলো
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।

কখন্ শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্য-তল ফুঁড়ি' ;
জান্ত না তো আপনাকে সে,
শুধায়নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খেপা বাতাস এসে,
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে।
সে-যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপ্ড়ি-ভারে আপনি সমাকুল।
আপ্নাকে তার চিন্তে-যে আর নাইকো বাকি,
তাই তো থাকি' থাকি'
চম্কে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশ-পারের বাণী তা'রে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝর্না বেয়ে ;
রাতের অন্ধকারে
কোন অসীমের রোদন-ভরা বেদন লাগে তা'রে।
বাহির হতে তা'র
ঘুচে গেছে সকল অলংকার ;
অন্তর তা'র রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তাই দেখে সে আপ্নি ভেবে মরে।
কখন কাজের ফাঁকে
জান্লা ধ'রে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ঐ সজ্নে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাত্তি।
যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথী
আজ সে কেমন ক'রে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভ'রে।

অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।
পায়ের শব্দ তারি
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি'।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুন্‌গুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎ-নিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে না কো—
কেঁদে বলে,"হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো।"

একদা বাপ দুপুর বেলায় ভোজন সাঙ্গ ক'রে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধ'রে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়্‌তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বল্‌লেন, বাতাস ক'রে গায়ে,
কখনো-বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্ব'রে
আমি কিন্তু পারি যেমন ক'রে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।"
বাপ বল্‌লেন, কঠিন হেসে,"তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে,
সেই ক-টা দিন থাকো ধৈর্য ধ'রে।"

এই ব'লে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বল্‌লেন, "উঃ কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহ মায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে।"
বাপ বল্‌লেন, "আমি পাষাণ বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননীর পুতুল হোলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গ'লে।"

মা বল্‌লেন, "হায় রে কপাল। বোঝাবই-বা কারে।
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুক্‌নো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে, সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।"

বাপ একটু হাস্‌ল কেবল, ভাব্‌লে "মেয়েমানুষ,
হৃদয়-তাপের ভাপে-ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন—নেই সে ওদের জ্ঞান।"
এই ব'লে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ'লে জ'লে অবশেষে নিব্‌ল মায়ের তাপ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রী-পুত্রদের সাথে
বিদেশে পাট্‌নাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে
শ্বশুরবাড়ি আছে।

একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরও দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবা-ভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হোত না তাঁর রুচি।
সকাল-বেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যা-বেলায় রুটি কিংবা লুচি;
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হোত পাঁচটা ছ-টা;
পাঁঠা হোত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দু-বেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোষাক আপনি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে' রাখে।
গয়লানি আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হোলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তা'র কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নালিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে পদেই ঘটে-যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হয়ে নীরব নত,

মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন ক'রে মাতা বারংবার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেম্‌নি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
"আমার মায়ের যত্ন যে-জন পেয়েছে একবার
আর কিছু কি পছন্দ হয় তার।"

হোলির সময় বাপকে সে-বার বাতে ধর্‌ল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হোলো তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হোতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়
মঞ্জুলি তা'র সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনো দিন।
গলাটি তা'র কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।

ভয়ে মরে বিরহিণী
শুন্‌তে যেন পাবে কেহ রক্তে-যে তা'র বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তা'র বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে।

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল ক'মে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যা-বেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বল্‌তে যেয়ে
চুপ্‌ ক'রে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগী-সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—
"জানো তুমি, তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।
সে-ইচ্ছাটি তাঁরি
পুরাতে চাই যেমন ক'রেই পারি।
এমন ক'রে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি।"
"না, না, ছিছি, ছিছি।"
এই ব'লে সে-মঞ্জুলিকা দু-হাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝ'রে পড়ে।
ভাবলে, "পোড়া মনের কথা এড়ায়নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো। এবার মরণ হোক।

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগ্‌ল দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধ'রে।
আবশ্যকটা সারা হোলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে-বাসনটা মাজা হোলো আবার সেটা মাজে।
দু-তিন ঘণ্টা পর
একবার যে-ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন-যে স্নান, কখন-যে তা'র আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল না কো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হয়ে আপনি ঘুরে' মেঝের 'পরে লোটায়;
যে-দেখলে সে-ই অবাক হয়ে রইল চেয়ে,
বল্‌লে "ধন্যি মেয়ে।"
বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব করিনে কো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা-যে ওর। নইলে দেখতে অন্য রকম হোত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।"

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবে মাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে' মঞ্জুলিকার হয়নি কো বিশ্বাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিঃশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব,
আসছে ঘরে নানারকম বিলিতি আসবাব।

দেখলে বাপের নূতন ক'রে সাজসজ্জা শুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকাচুল সব কখন হোলো কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখায় ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে-যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জা ভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,—
"তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে।
আমরা তোমার ছেলে মেয়ে নাত্‌নি নাতি যত
সবার মাথা করবে নত।
মায়ের কথা ভুলবে তবে।
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে।"

বাবা বললে শুষ্ক হাসে,
"কঠিন আমি কেই-বা জানে না সে।

আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হোলে অপূর্ণ-যে রয়
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে, দুঃখ দিতে
সে-কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।”
বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের ক-দিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি প'ড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে ;
সেইখানেতেই ঘর পাতবে ব'লে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

(* জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) —পলাতকা

হারিয়ে যাওয়া

ছোট্টো আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুন্‌তে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে

হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানী

আমি ছিলাম ছাতে
তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কী হয়েছে বামি।"
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

তারায়-ভরা চৈত্র মাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হোলো আকাশ-পানে চেয়ে
আমার বামির মতোই যেন অম্‌নি কে-এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপ-শিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে
নিব্‌ত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি',
আকাশ ভ'রে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি॥"

প্র—ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৫) —পলাতকা।

———

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি' দুই হাত
যেখানে করিস পদ-পাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব ;
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলা-ভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণাচক্র-'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংস-মাঝে মুক্তি দিস অনর্গল ;
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।
অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস যা তোর ইচ্ছা তাই।
যাহা খুশি তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে।
আবরণ তোরে নাহি পারে সংবরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি-'পর।
লজ্জা-হীন সজ্জা-হীন বিত্ত-হীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি'।
ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে ;

দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি'।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি,
তবে তোর মত্ত নর্ত্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে॥

(* ১৩২৫) —শিশু ভোলানাথ।

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুন্‌গুনিয়ে কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার দোল্‌না ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে॥
মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে ভোরে শিউলি বনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে ভাসে।
কবে বুঝি আনত মা সেই ফুলের সাজি বয়ে,
পূজোর গন্ধ আসে-যে তাই মায়ের গন্ধ হয়ে॥

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধ'রে কবে দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে॥

(৯ আশ্বিন, ১৩২৮) —শিশু ভোলানাথ

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস, আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায় হোত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে আমায় যেত ডেকে।
"মা" ব'লে তার সাড়া দেব কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার নেচে উঠত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায় আমার কানে কানে
টলমলিয়ে কী বলত যে ঝলমলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তারা নাচন দিত জুড়ি'।
উড়ো গাছের ছায়াটি তোর কোথায় থেকে এসে
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে' কোথায় যেত ভেসে।
সেই হোত তোর বাদল বেলার রূপকথাটির মতো;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায় পেরিয়ে রাজ্য কত;

সেই আমারে ব'লে যেত কোথায় আলেখ-লতা,
সাগরপারের দৈত্য-পুরের রাজকন্যার কথা ;
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর চক্ষু ভরো-ভরো
শিউরে উঠে পাতা আমার কাঁপত থরোথরো।
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার হাওয়ার পাছে পাছে
নামত আমার পাতায় পাতায় টাপুর-টুপুর নাচে ;
সেই হোত তোর কাঁদন স্বরে রামায়ণের পড়া,
সেই হোত তোর গুনগুনিয়ে শ্রাবণ-দিনের ছড়া।
মা, তুই হতিস নীলবরনী, আমি সবুজ কাঁচা ;
তোর হোত, মা, আলোর হাসি, আমার পাতার নাচা।
তোর হোত মা, উপর থেকে নয়ন মেলে চাওয়া,
আমার হোত আঁকুবাঁকু হাত তুলে গান গাওয়া।
তোর হোত, মা, চিরকালের তারার মণিমালা,
আমার হোত দিনে দিনে ফুল-ফোটাবার পালা।

(* ফাল্গুন, ১৩২৮) —শিশু ভোলানাথ।

চিরন্তন

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা
মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে ;
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে ॥

যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়—
কাঁটা-লতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান ঘনঘাসের
পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায় ;
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাকলে ॥

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে গো দিন যেমন আজো দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এমনি সেদিন উঠবে ভরি',
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই-বা আমায় ডাকলে ॥

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই-বা আমায় ডাকলে ॥

(* বৈশাখ, ১৩২৪) —প্রবাহিনী

বাঁধন-হারা

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।
আমি-যে বন্দী হোতে সন্ধি করি সবার কাছে ॥
সন্ধ্যা আ'কাশ বিনা ডোরে বাঁধল মোরে গো,
নিশিদিন বন্ধ-হারা নদীর ধারা আমায় যাচে ॥
যে-কুসুম আপনি ফোটে আপনি ঝরে রয় না ঘরে গো,
তারা-যে সঙ্গী আমার বন্ধু আমার চায় না পাছে ॥
আমারে ধরবি ব'লে মিথ্যে সাধা ;
আমি-যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।
আপনি যাহার প্রাণ দুলিল মন ভুলিল গো,
সে-মানুষ আগুন-ভরা, পড়লে ধরা সে কি বাঁচে।
সে-যে ভাই হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথী, দিবারাতি গো,
কেবলি এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে ॥

(১৩২৩ ?) —প্রবাহিনী।

মাটির প্রদীপ

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যা-তারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে ॥
সেই আলোটি নিমেষ-হত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে।

সেই আলোটি নেবে জলে
শ্যামল ধরার হৃদয়-তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌ল সন্ধ্যা-তারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি',
অমর শিখা আকুল হোলো মর্ত্য শিখায় উঠতে জ্বলে॥

(১৩২৫ ?) —প্রবাহিনী

পাগল

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।
বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥
আমি-যে তোর আলোর ছেলে,
সাম্‌নে দিলি আঁধার মেলে',
মুখ লুকালি, মরি আমি সেই খেদে,
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥

অন্ধকারে অস্ত-রবির লিপি লেখা,
আমারে তার অর্থ শেখা।
প্রাণের বাঁশির তান-সে নানা,
সেই আমারই ছিল জানা,
মরণ-বীণার অজানা সুর নেব সেধে;
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥

(আষাঢ়, ১৩৩০) —প্রবাহিনী

মিলন

আমার দিন ফুরাল ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে ॥
বনের ছায়ার জল ছলছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে।
খনে খনে ঐ গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্ বাজে ॥
কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা,
গোপন-মিলন-অমৃত গন্ধ-ঢালা ;
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তার অজানা জনের সাজে ॥

(১৩২৫ ?) —প্রবাহিনী।

তপোভঙ্গ

যৌবন-বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্য-মনে গিয়েছ কি ভুলি',
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুক-মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি'।
আশ্বিনের বৃষ্টি-হারা শীর্ণ-শুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল কি বিস্মৃতিঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায় ॥

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি'।
দস্যু তারা হেসে হেসে হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙ্গা, হাতে দিল মন্দিরা, বাঁশরি।
গন্ধ-ভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্য-রভসে॥

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্ক-পত্রে-ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যান-মন্ত্রটিরে আনিল বাহির তীরে
পুষ্প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন-পত্রে জ্বালি' দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা॥

বসন্তের বন্যা-স্রোতে সন্ন্যাসের হোলো অবসান,
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য তব উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হোলো আপনাতে আপন বিস্ময়।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার॥

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।

ললাটের চন্দ্রালোকে নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা॥

সেদিনের পান-পাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা,
মুছিলে, চুম্বন-রাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে।
অগীত সংগীত-ধার, অশ্রুর সঞ্চয়-ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।
তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হোলো সে কি ধূলি
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি'
লুপ্ত দিনগুলি॥

নহে নহে, আছে তারা, নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সংবরিয়া
রাখো সংগোপনে।
তোমার জটায় হারা গঙ্গা আজ শান্ত-ধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে,
"নাহি রে, নাহি রে॥"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তর-তলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিস্তব্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে ॥

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খল হীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ ॥

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়-মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি' ॥

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণ-বেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে ॥

জানি জানি বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহ-তলে
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে।
ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণা-তন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি ॥
আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি'
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে,
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে ॥

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি,'
প্রাতঃসূর্য-রুচি।
অস্থি-মালা গেছে খুলে মাধবী-বল্লরী মূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি'।

কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে,
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরানে ॥

(কার্তিক, ১৩৩০) —পূরবী

লীলা-সঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হোলো যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে।
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি ॥

এলোচুলে ব'হে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল।
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল।
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সে-দিনের তুমি এলে এ-দিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।

অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সে-দিনের পরিমল ॥
মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমার নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে ॥
নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে'
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন খনে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে ॥
কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে।
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা প্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,

অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে।
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে॥

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি।
কল্পনা-পটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি।
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চ'লে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কল-গুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি॥

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি'
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন॥

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে।

মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে।
সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তারে।
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে॥
যদি রাত হয়, না করিব ভয়,
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে না-ই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী,
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় ব'লে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রসতরঙ্গিণী
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি॥

ফাল্গুন, ১৩৩০) —পূরবী।

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি'
ফেলো, ফেলো টুটি'।
হে সূর্য হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক পদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি'।

বহ্নি-বীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্ম-কালে
প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি'
আমার কপালে॥

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বসি' উঠিল মন্দ্রি' বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত॥

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নমঃ।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি' তমঃ,
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি'
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবন হিল্লোল॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী,
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।

আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশির-চ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ॥
তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভ'রে
কেই-বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা,
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় স'রে।
তেমনি সহজ হোক হাসি কান্না ভাবনা বেদনা,
না বাঁধুক মোরে॥
তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ বর্ষণে।
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপল ঘর্ষণে,
ঝঞ্ঝার মদিরা-মত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে॥
হে রবি প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।

জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালী॥
দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হোলো শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎস-ধারে।
সীমন্তে গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সংগীত-ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

(২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪) —পূরবী।

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারংবার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী, বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
　　চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
　　কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্ম-বিস্মৃতির
　　তমসার মাঝে
কোথা হতে অকস্মাৎ করো মোরে খুঁজিয়া বাহির
　　তাহা বুঝি না যে ॥
　　তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি
　　　　"আছি, আমি আছি।"
　　সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি',
　　　　বাঁচি, আমি বাঁচি।
　　তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
　　　　আলো ওঠে জ্ব'লে,
　　অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
　　　　নৃত্য-কলরোলে ॥
নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
　　দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি' কারে
　　চলে যায় ডাকি'।
অমনি প্রভাত তা'র বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
　　শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হস্তে আকাশে আকাশে,
　　ক্লান্তি নাহি জানে ॥
　　কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
　　　　রচিতেছে গান
　　আলোকের বর্ণে বর্ণে, নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
　　　　করিছে আহ্বান।

তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে,
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে ॥
তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি'
পত্রপুষ্প-ভারে ।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বদ্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি'
রহস্য-সমুদ্র-তল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি ॥
তুমি সে আকাশ-ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী ।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকুতি ।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি নারী,
দু'বাহু বাড়ালে ॥
তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সংগীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে ।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে,
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে ॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি'
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা ব'সে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস॥
নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে।
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা ব'সে রয়েছ রমণী,
নীরব নিশীথে॥
মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি',
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি' করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে॥
তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি', দিগন্ত-অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।

স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি,
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি ॥
ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রা-সহচরী।
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি'
নিকুঞ্জ-ভবন
গন্ধের ইঙ্গিত্‌ দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্‌ সিন্ধুপার ॥
জানি জানি আপনার অন্তরের গহন-বাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী।
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ॥
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হোলো তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী ॥

(১ অক্টোবর, ১৯২৪) —পূরবী

ক্ষণিকা

খোলো, খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা,
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥
ভেবেছিনু গেছি ভুলে, ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার।
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি'॥
বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি'।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল, তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনা-পদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী॥
সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারেনি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি'
বারেক ফিরায়ে মুখ পথ-মাঝে দাঁড়াতে থমকি'
তাহোলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তাহোলে পরম লগ্নে, সখি,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি'॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান;
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি।
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান
কথা ছিল শুধাবার, সময় হোলো যে অবসান॥

গেল না ছায়ার বাধা, না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়-মোহের নেশা। সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে॥

খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা,
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা॥

(৬ অক্টোবর, ১৯২৪) —পূরবী।

সমুদ্র

১

হে সমুদ্র, স্তব্ধ চিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা; মনে হোলো গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই, তোমার সান্ত্বনা;
যুগ যুগান্তর ধরি' নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহা দ্বীপ মহা-বন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্ন-হারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি'
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন দুলিছে একাকার।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জন॥

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোল মন্দ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ ঊর্ধ্ব লোকে
চাহিলাম; শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখিলাম শূন্য-মাঝে
আঁধারের আলোক ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি' তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে

প্রকাশ-উৎসব দিনে। যুগ সন্ধ্যা কবে এল তার,
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপ-নিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্ত রূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল॥

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যা-হীন সংজ্ঞা-হীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা;
বিশ্বগীতি-নির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জন্মে; দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙি'
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি'
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারাল তা'রা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতি-হারা সেই স্মৃতি-হারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলা ঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে॥

(২১শে অক্টোবর, ১৯২৪) —পূরবী

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে,
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কানন-তলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার॥
বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এত কাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্ত-শেষের দিন মম॥
ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে,
তোমার বিকচ ফুল-বনে
দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণা রসে ভরি'॥
ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায়নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি,
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।

পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধ'রে, ঝলুক তোমার কালো কেশে ॥
হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বন-সরসীর তীরে
ভীরু কাঠ-বিড়ালীরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ ॥
তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা-পাতা দ্রুতপদে দ'লে
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলি রবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।
বেণুবনচ্ছায়া-ঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে ॥
রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

(২২শে নভেম্বর, ১৯২৪) —পূরবী।

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি' থাকি'।
হৃদয় কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি' দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি',
হে কালো কাজল আঁখি॥

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু;
বলে এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধু-সঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ ক'রে,
এসো এ-বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে॥
দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবন বেগে
সুখের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছল-ছলি'
এ-পারে ও-পারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদায় রাতি,
নিখিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি'
আছে অঞ্জলি পাতি'॥

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি' সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি॥

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি।
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ,
পাওনি কি সংবাদ।
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটেনি কি সে-বারতা।
শোনোনি কী গাহে পাখি।
হে কালো কাজল আঁখি॥
শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল;
বেণু শাখাগুলি খনে খনে টলমল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল,
কিছু না রহিল বাকি।
এল-যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি',
হে কালো কাজল আঁখি॥

(১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) —পূরবী

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে,
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে
তাই সে যে গেয়ে উঠে,
কিছু তার বুঝি নাহি বুঝি।
তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি' খুঁজি'

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে,—
মলিন আকাশ তলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারি গান গেয়ে॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্ত-নিশীথ সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানাল সে কথা যে
গোপন হৃদয় মাঝে
আজো তাহা বুঝিতে পারিনি।

মনে হয় পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লীরবে তাহার কিঙ্কিণী ॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলি পরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ ক'রে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, "এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি,"
আমি বলি বুঝাতে পারিনে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ব-বনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানিনে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
"কী কহ", সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

(২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৪) —পূরবী।

শিবাজী-উৎসব

১

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে—
হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"এক ধর্ম-রাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

২

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খ-নাদ।
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লী-সন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

৩

তার পরে এক দিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি' দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্র-লিখা।

মোগল-উষ্ণীষ-শীর্ষ প্রস্ফুরিত প্রলয়-প্রদোষে
পক্বপত্র যথা—
সেদিনো শোনেনি, বঙ্গ, মারাঠার সে বজ্র-নির্ঘোষে
কী ছিল বারতা।

৪

তার পরে শূন্য হোলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লি-রাজ-শালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোক-মালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হোলো তার সীমা।

৫

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য-বিপণীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুরঙ্গ-পথের অন্ধকারে
রাজ-সিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি'
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

৬

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি
কোথা তব নাম।
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধুলায় হোলো মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম।

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে উপহাস
অট্টহাস্য রবে—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে।

৭

অয়ি ইতিবৃত্ত-কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী।
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।

৮

হে রাজ-তপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হয়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন।

৯

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজ-বৈরাগী
গিরিদরীতলে,
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি'
পরিপূর্ণ বলে,—

সেই-মতো বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা।

১০

সেই-মতো ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে—
কী অপূর্ব হেরি।
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরী।
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্রা বিদারি'
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচী-দিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি',
উদিল আবার।

১১

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম-পরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি' বেশ
ভারতের দ্বারে।

১২

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্‌
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ,

তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বয়ে,
সেই তব কাজ।

১৩

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামী,
বাঙালির প্রাণ।

১৪

এ কথা ভাবেনি কেহ এ তিন শতাব্দ-কাল ধরি'—
জানেনি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে।
তোমার তপস্যা-তেজ দীর্ঘকাল করি' অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি' দিবে নূতন পরান,
নূতন প্রভাত।

১৫

মারাঠার প্রান্ত হতে এক দিন তুমি ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা ব'লে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।
তোমার কৃপাণ-দীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগ-দিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

১৬

মৃত্যু-সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর মুরতি—
সমুন্নত ভালে
যে রাজ-কিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্য-জ্যোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন্,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লয়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।

১৭

সে-দিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল।
"এক-ধর্ম-রাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।

১৮

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
"জয়তু শিবাজী।"
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি'।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

(শিবাজী-উৎসব, ১৩৩০)

———

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মনিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা ॥

—লেখন।

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ।

—লেখন।

তোমার বনে ফুটেছে শ্বেতকরবী,
আমার বনে রাঙা,
দোঁহার আঁখি চিনিল দোঁহে নীরবে
ফাগুনে ঘুম ভাঙা ॥

—লেখন।

হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পেল খুঁজি',
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি ॥

—লেখন।

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে ॥

—লেখন ।

শিখারে কহিল হাওয়া,
"তোমারে তো চাই পাওয়া।"
যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে
নিবে গেল দাবি-দাওয়া ॥

—লেখন ।

বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী,
রজনীগন্ধা-যে তবু চেয়ে আছে বসি' ॥

—লেখন ।

দিন হয়ে গেল গত ।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয়-দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে-আসা
পথিক দুরাশা যত ।

—লেখন ।

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কয় তট-ভূমি
"তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি ।"

সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে
যত বার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অতৃপ্তি ভরে
তত বার মোছে রেখা ॥

—লেখন।

একটি পুষ্পকলি
এনেছিনু দিব বলি,
হায় তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
লও, তাই লও তুমি ॥

—লেখন।

পথে হোলো দেরি, ঝরে গেল চেরি,
দিন বৃথা গেল, প্রিয়া।
তবুও তোমার ক্ষমা হাসি বহি'
দেখা দিল আজেলিয়া ॥

—লেখন।

অনন্ত কালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া,
মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী ছায়া ॥

—লেখন।

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

—লেখন।

আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে ক'রে রাখে,
ছবি বলি তাকে ॥

—লেখন।

মায়া

চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব
চুপে চুপে।
সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন বনের
ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে ॥

সেথায় নিয়ে যাব আমার
দীপশিখা,
গাঁথব আলো-আঁধার দিয়ে
মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
পরিয়ে দেব চুলে ;
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
কী বিস্মৃতির ॥

পরশ মম লাগবে তোমার
কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
বসন্ত বাহার,
পূরবী কি ভীমপলাশী
রক্তে দোলে—
রাগরাগিণী দুঃখে সুখে,
যায়-যে গ'লে ॥

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা,—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপ্‌নি র'চে
আপন করো ॥

(২৪ শ্রাবণ, ১৩৩৫) —মহুয়া।

প্রকাশ

আচ্ছাদন হতে
ডেকে লহ মোরে তব চক্ষুর আলোতে।
অজ্ঞাত ছিলাম এত দিন
পরিচয়হীন,—
সেই অগোচর-দুঃখ ভার
বহিয়া চলেছি পথে ; শুধু আমি অংশ জনতার
উদ্ধার করিয়া আনো,
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
যেথা আমি একা
সেথায় নামুক তব দেখা।
সে মহা নির্জন,
যে-গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন,
সেইখানে আনো আলো
দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
যাক লজ্জা ভয়,
আমার সমস্ত হোক তব দৃষ্টিময় ॥

ছায়া আমি সবা কাছে, অস্ফুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে ;
তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ।

সত্য যদি হই তোমা কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে,—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহ মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার।
বহিতেছি অজ্ঞাতের বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে॥

(২৪ শ্রাবণ, ১৩৩৫) —মহুয়া।

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হোলো।
তখন বর্ষণশেষে ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্-মোরের থোলো।
বনের মন্দির মাঝে তরুর তম্বূরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল বহে যায়, নম্র হোলো বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ॥
দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর

অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে লিখিছে আকাশ পাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে এ-দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি' আমার উন্মনা আঁখি
এ-দেখার গূঢ় গান গাহে॥

বোলো আজি তারে,
চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে বারংবার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে, প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে আসা নিঃশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি আমার গুণ্ঠন খানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার॥

বোলো তারে আজ,
"অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।"

(২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৫) —মহুয়া।

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে।
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ, আমি আছি॥
উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি॥
দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,
মরুপথ-তাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি' মিছে
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যত দিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী তুমি আছ, আমি আছি॥

(৩১ শ্রাবণ, ১৩৩৫) —মহুয়া

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়্‌না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত ॥
নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্‌ড্রন্‌ গুচ্ছ ॥
নাই আমাদের সঞ্চিত ধন-রত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথ পাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত ॥

(*আষাঢ়, ১৩৩৫।) —মহুয়া

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ন মেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে,
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায়,
শূন্যে যেন মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
নারদ হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু কটাক্ষচ্ছটায় ॥
সে-দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ণছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে ॥
মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে,
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়েনি ধুলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার ॥
সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে, সখী,
একটি কেতকী।

তখন হয়নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে॥
দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী,
“কী এনেছ” বলি’।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত॥
ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে।
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।
সহজ-সাধনা-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্য রাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধ নিরুদ্ধ যে-সম্মান
তাই তব দান॥

(৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৬) —মহুয়া

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি’

দৈবাগত দিনে।
শুধু কি চাহিব শূন্যে, কেন নিজে নাহি লব চিনে'
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্‌গা পাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।
যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে।
তরঙ্গ গর্জনোচ্ছ্বাস, মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি' কব তারে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি,'
সপ্তর্ষি আলোকে যবে যাবে তা'রা পন্থা অনুমানি'।
হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে-নির্ঝর নৈঃশব্দের নিস্তব্ধ সাগরে॥

(৭ই ভাদ্র, ১৩৩৫) —মহুয়া।

সাগরিকা

সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকর-চূড় মুকুটখানি পরি' ললাট 'পরে,
ধনুক-বাণ ধরি' দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশি॥"
চমকি' ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি' শিলা-আসন-ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে।"

কহিনু আমি "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুল-বনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী তুলিনু চাঁপা ফুল।
দুজনে মিলি' সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু এক মনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি'
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি॥
সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরি-শিখর 'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি," কহিনু দ্বারে আসি'।
তরাস-ভরে চকিত-করে প্রদীপখানি জেলে,
চাহিলে মুখে, কহিলে "কেন এলে।"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।"
চাহিলে হাসি-মুখে,
আধো-চাঁদের কনক-মালা দোলানু তব বুকে॥
মকর-চূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে,
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতন-সাজ করিল ঝলমল।
মধুর হোলো বিধুর হোলো মাধবী নিশিথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগর জলে দোলে॥

ফুরাল দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যা-বেলা ভাসিল জলে আবার তরী-খানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগর-তলে দারুণ ঢেউ তুলে'।
লবণ-জলে ভরি'
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতন-ভরা তরী।
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে,
ভূষণ-হীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি'
তেমনি ক'রে রয়েছে ভ'রে ডালিতে ফুলগুলি॥
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগর-জলে যবে,
নীরব তব নম্র নতমুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে-রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে॥
মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপ-খানি ধরি'।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে,
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুল-বনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনেতে পারো কি না॥

(আশ্বিন, ১৩৩৪) —মহুয়া

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি', বসন্তের আনন্দ ভাণ্ডার
তখনো হয়নি নিঃস্ব। আমার বরণ পুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখো নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্ত পঞ্চমে।
আমার অঙ্গন তলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভ বিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জ গৃহদ্বার
এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছে আলিপনা। প্রতি সন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হোলো অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ।
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণ দ্বারে
যে-পথ করিলে শুরু সে-পথের এখানেই শেষ।
হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভ লেশ,
নাই অভিমান তাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায়,
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ, আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহ গুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব

অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর। আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে; দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্রকলা।
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

(২৭শে পৌষ, ১৩৩৫) —মহুয়া।

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন

ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি' তার জাল,-
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে

তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখো চাহি'
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মুরতি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাকো, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে ;
তৃষ্ণার্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানসভোজে সযত্নে সাজালে
যে-ভাব-রসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিয়া পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি'
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায় ॥

(আষাঢ়, ১৩৩৫) —মহুয়া।

অন্তর্ধান

তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি ॥

জীবন আঁধার হোলো, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে ॥

(২৬ আষাঢ়, ১৩৩৫) —মহুয়া।

—

বর্ষা-মঙ্গল

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনাল মনে।
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে ॥

তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারংবার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।
চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠাল তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া ॥

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ।
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে' দুলে'
কাঁকন-দোলন ছন্দ।
মনে পড়িল কি নীল নদীজলে
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে,
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ ;

স্থকিত পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রান্ত।
মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে' ঝারি
তরু তলে তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচন-শিথিল বাহু দুটি তারি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত।
ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি'
ঝর ঝর ধারাজলে—
তমাল বনের শ্যামল তিমির তলে।
দ্যুলোকে ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চির-বিরহের কথা,
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি'
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি' গৃহকোণে
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।
কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি'
আতুর নয়নে দু-হাতে আঁচল ঝাঁপে।

তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি'
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠো গাহি',
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।

যাক যাক তব মন গ'লে গ'লে যাক
গান ভেসে গিয়ে দূরে চ'লে চ'লে যাক,
বেদনার ধারা দুর্দাম দিশাহারা
দুখ-দুর্দিনে দুই কূল তার ছাপে।

কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি',
সেই মতো তব কম্পিত বাহু তুলি'
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি',
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে জাপে

—বনবাণী।

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণি দিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল,
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানি পেশোয়াজ,
ফিকে সবুজের পরে ফুলকাটা সোনালি-রঙের।
বিলেতের হাট থেকে এল তার বর;
সেকালের রাজপুত্র কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথায় টুপিতে উঁচু পাখির পালখ,
কাল হবে অধিবাস পর্শু হবে বিয়ে।

সন্ধ্যে হোলো।
পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেকট্রিক বাতি।
কোথা থেকে এল এক কালো চামচিকে,
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে
সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।
হানাসান ডেকে বলে,
"চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে,—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।"

মণি দিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল, কোথা গেল।
বটগাছে আঙিনার পারে
বাসা করে আছে ব্যাঙ্‌গমা,
সে বলে, "আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।"
মণি বলে, "হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্‌গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো,
ফিরিয়ে আনিগে॥"
ব্যাঙ্‌গমা মেলে দিল পাখা,
মণি দিদি উড়ে চলে সারারাত্রি ধ'রে।

ভোর হোলো, এল চিত্রকূটগিরি,
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে, "হানাসান, কোথা হানাসান,
খেলা যে আমার পড়ে আছে।"
নীল মেঘ বলে এসে
"মানুষ কি খেলা জানে।
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে।"
মণি বলে, "তোমাদের খেলা কী রকম।"
কালো মেঘ ভেসে এল,
হেসে চিকিমিকি,
ডেকে গুরু গুরু
বলে, "ঐ চেয়ে দেখো, হানাসান হোলো নানাখানা,
ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়,
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে,
আলোতে আলোতে।"
মণি বলে, "ব্যাঙ্‌গমা দাদা,
এদিকে বিয়ে যে ঠিক
বর এসে কী বলবে শেষে।"
ব্যাঙ্‌গমা হেসে বলে,
"আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সে-ও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।"
মণি কেঁদে বলে "তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা।"

ব্যাঙ্গমা বলে "মণি দিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টি-ধোওয়া
মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিন্‌বে না কেউ ॥

(১৩ আষাঢ়, ১৩৩৯) —পরিশেষ।

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধোসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিক্‌টিকি।
তফাৎ আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব ॥
বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি।

খেতে পাই দত্তদের বাড়ি

ছেলেকে পড়িয়ে।

শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,

সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসি,

আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।

এঞ্জিনের ধস্ ধস্,

বাঁশির আওয়াজ,

যাত্রীর ব্যস্ততা,

কুলি হাঁকাহাঁকি।

সাড়ে দশ বেজে যায়,

তারপরে ঘরে এসে নিরালা নিঝুম অন্ধকার

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম

তাঁর দেওরের মেয়ে,

অভাগার সাথে তার, বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।

লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল,—

সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।

মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,

আমি তথৈবচ।

ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া,—

পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর॥

বর্ষা ঘন ঘোর।

ট্রামের খরচা বাড়ে,

মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।

গলিটার কোণে কোণে

জ'মে ওঠে প'চে ওঠে

আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভুতি,

মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাই পাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।

দিন রাত মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা প'ড়ে আছি।
গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ॥
কর্নেট বাজানো তার শখ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে—
কখনো বৈকালে
ঝিকি মিকি আলোয় ছায়ায়।

হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহ বেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি' চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর॥

(২৫ আষাঢ়, ১৩৩৯) —পরিশেষ।

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পুবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারি চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়্‌চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় ;—
বাতাবি লেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে।
জারুল পলাশ মাদার চলেছে রেশারেশি,
সজ্‌নে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়,
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ায় গায়ে গায়ে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারি এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।
নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,

তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নিচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস
আর ঢালুতটে চ'রে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীলরঙের জাজিম পাতা
খয়েরি রঙের ফুল-কাটা।
দেয়াল বাসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।
একটি মানুষ পেয়েছি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটীরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুমকো-লতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনি পাই শুনতে,—
গাইতে বলিনি তাকে
স্বামীটি তার লোক ভালো,
আমার লেখা ভালবাসে—
ঠাট্টা করলে যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে।—
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে।

আবার হঠাৎ কোনো একদিন আলাপ করে
—লোকে যাকে চোখ-টিপে বলে কবিত্ব—
রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

বাড়ির পিছন দিকটাতে'
শাক-সব্‌জির খেত।
বিঘে দুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আম কাঁঠালের বাগিচা
আস্‌শেওড়ার বেড়া-দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুনগুন গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে ক্ষেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে।
নদীর ওপারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন,—
সেদিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি,
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
এই পর্যন্ত।
এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিওনি কোনোদিন।—
ওর নাম শুনিনে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,

সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে ॥

(৩ ভাদ্র, ১৩৩৯)

শেষ চিঠি

মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েছে আমার
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই,—
হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদুনে।
অমলির ঘরে ঢুকতে পারিনি বহুদিন
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ ক'রে—
তাই খুললেম ঘরের তালা।
এক জোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি,
শেল্‌ফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।
একটা অ্যালবম,
ছবি কেটে কেটে জুড়েছে তার পাতায়।

আলনায় তোয়ালে জামা,
খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাঁচের আলমারিতে
নানারকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।
চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে
টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে।
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।
ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমার ঠিকানা লেখা,
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে।
শুনেছি ডুবে মরবার সময়
অতীতকালের সব ছবি
এক মুহূর্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—
চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে।
অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাতবছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে
ও বুঝি আর বাঁচবে না বেশিদিন।—
কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকাল বিচ্ছেদের ছায়া
ভাবী কাল থেকে উলটে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হোত না ওকে সঙ্গ-ছাড়া করি।

কাজ করছি আপিসে ব'সে
হঠাৎ হোত মনে
যদি কোনো আপদ ঘ'টে থাকে ।
বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে,—
বললে, মেয়েটার পড়াশুনো হোলো মাটি—
মুর্খু মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে ।
লজ্জা পেলেম কথা শুনে
বললেম কালই দেব ভরতি ক'রে বেথুনে ।
ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে ।
কতদিন ইস্কুলের বাস্ অমনি যেত ফিরে' ।
সে চক্রান্তে বাপের ছিল যোগ ।
ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে,
বললে, "এমন ক'রে চলবে না ।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে,—
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে ।"
মাসির সঙ্গে গেল চলে ।
অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভ'রে,
যেতে দিলেম ব'লে ।
বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়,—
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে ।
চার মাস খবর নেই ।
মনে হোলো গ্রন্থি হয়েছে আলগা
গুরুর কৃপায় ।
মেয়েকে মনে মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে,-
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা ।

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশীতে—
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি,—
কী আর বলব,—
দেবতাই তাকে নিয়েছে।—
যাক্ সে সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা,—
"তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করছে।"
আর কিছুই নেই॥

(৩১ শ্রাবণ, ১৩৩৯) —পুনশ্চ।

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,—
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
"বাসি ফুলের মালা।"—
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,
দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।
নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।

একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।
তোমাকে দোহাই দিই
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও,
কেমন ক'রে প্রমাণ করবে সে,
এমন ক-জন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।
কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো।
এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করব-যে সাহস হয় না ;—
না করব-যে এমন জোর কই।
একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।
আর তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি,—
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
"এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চ'লে,
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে,—
দুর্লভ মূল্যহীন।"
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গী।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে
"কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার,—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।"
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো না হয় তাই হোলো,
না হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।
পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,—

যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ সপ্তরথীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে'।
ফুল চন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।
তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই ;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।
কী ক'রে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো না কেন নরেশকে সাতবছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল্ করুক তার পরীক্ষায়,

আদরে থাক্ আপন উপাসিকা-মণ্ডলীতে
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম, এ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম, তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ঐখানেই যদি থামো
তোমার সাহিত্য-সম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান যারা বীর,
যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারিদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজ্‌দার, আছে দরদী,
আছে ইংরেজ, জর্মান, ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক না,—
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।

(এইখানে জনান্তিকে ব'লে রাখি,
স্বষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বলতে হোলো নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।
আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটে শাকটি মুড়োলো।
স্বপ্ন আমার ফুরোলো।
হায়রে সামান্য মেয়ে,
হায়রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়॥

(২৯ শ্রাবণ, ১৩৩৯) —পুনশ্চ।

যাত্রা

রাজা করে রণযাত্রা,
বাজে ভেরী বাজে করতাল,
কম্পমান বসুন্ধরা।
মন্ত্রী ফেলি' ষড়যন্ত্র জাল
রাজ্যে রাজ্যে বাধায় জটিল গ্রন্থি।
বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার ভাঁটায়।

পণ্য-পোত
ধায় সিন্ধু পারে পারে।
বীর কীর্তিস্তম্ভ হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানব-কঙ্কাল স্তূপে,
ঊর্ধ্বে তুলি' মাথা
চূড়া তার স্বর্গপানে হানে অট্টহাস।
পণ্ডিতেরা
আক্রমণ করে বারংবার
পুঁথির প্রাচীর ঘেরা
দুর্ভেদ্য বিদ্যার দুর্গ।
খ্যাতি তার ধায় দেশে দেশে।
হেথা গ্রামপ্রান্তে
নদী বহি' চলে প্রান্তরের শেষে
ক্লান্ত স্রোতে।
তরীখানি তুলি' লয়ে নব বধূটিরে
চলে দূর পল্লীপানে।
সূর্য অস্ত যায়।
তীরে তীরে
স্তব্ধ মাঠ।
দুরু দুরু বালিকার হিয়া।
অন্ধকারে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় দিগন্তের ধারে॥

(১৩৪০, শ্রাবণ) —বিচিত্রিতা।

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে

স্থির জেনেছিলেম পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয়নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য করোনি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে ;
পরদিনে মনে রইল না।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।
তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;
আরো দেওয়া হোলো না
আরো যে আমার নেই।"
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছল্‌ছলিয়ে।
আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আসো না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।
তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হোলো বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে॥

—শেষ সপ্তক।

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলন্তি আসনের উপর ব'সে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চ'ড়ে চলেছে কাল;
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে' ধরে,

পায় কিছু পানীয় ;—
পান সারা হোলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।
একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জানো না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তা'রা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;
তার সেদিনকার কান্না-হাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।
তার ভাঙা খেলনার টুক্‌রোগুলোও
দেখিনে ধুলোর পরে।
সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।

তার অবোধ চোখ-মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড়;
বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এদিক থেকে ওদিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল একগোত্রের।
সে-কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কাল-সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।
পঁচিশে বৈশাখ তারপরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যূষে
রঙিন আভায় অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

সেই শুনে কোনো কোনো দিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশ বনের রং-মাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,
কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।
তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুম-ভাঙা প্রভাতে
নতুন ফোটা বেলফুলের মালা;
ভোরের স্বপ্ন
তারি গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো-বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো-বা জেগেছিল চমকে উঠে'
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রং-করা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হোত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।
সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে-একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তারের পর নতুন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জন-সমুদ্রতীরে।
বেলা অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝ-দরিয়ায়
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ-বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানি-ভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে ঢাকা অঙ্গারের থেকে;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হাওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।
তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজো আছে
আমার গানে আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।

একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো-বা নিতে হোলো ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হোলো
জয় পরাজয়ের আবর্ত্তনের মধ্যে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে,
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্প-নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষ-পথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।
জেনেছ কি,
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত
অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন,
অনেক উপেক্ষিত।
অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,

খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত,
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে ;
নির্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়॥

—শেষ সপ্তক।

নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে যেন এককালে লিখিতাম
　　চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে।
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম,—
　　থাক্ সে কথায়,—লিখি বিনা নাম দিয়ে।
তুমি দাবি করো কবিতা আমার কাছে,
　　মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
　　নম্র চোখের কম্প্র কাজল রেখা।
সহজ ভাষায় কথাটা বলা-ই শ্রেয়,—
　　যে কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,-
সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
　　বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।
গৌরবরন তোমার চরণমূলে
　　ফলসাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো ;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
　　কপোল প্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
একগুছি চুল বায়ু উচ্ছ্বাসে কাঁপা
　　ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে,
ডাহিন অলকে একটি দোলন-চাঁপা
　　দুলিয়া উঠুক গ্রীবা-ভঙ্গীর সনে।
বৈকালে গাঁথা যূথী-মুকুলের মালা
　　কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে ;

দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল
—রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা—
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।
আরেকটা কথা ব'লে রাখি এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে,
তুচ্ছ শোনাবে তবু সে তুচ্ছ কই।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি রুমাল-টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তা'রা প্রিয়,
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ঐ দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা,
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।
তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদর-বিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও·

যবে দেখা দেয় সেবা-মাধুর্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয় ।
বুঝি অনুমানে চোখে কৌতুক ঝলে,
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফরমাশ করা ।
আচ্ছা, না হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো,
বরদানে, দেবি, না হয় হইবে বাম,
খালি হাতে যদি আসো, তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম ।
সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে,
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষ ডালের ফাঁকে ।
তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা,
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে
তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা ।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে,
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে ।
মনে ছবি আসে,—ঝিকিমিকি বেলা হোলো,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো,
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি ।
কুঙ্কুম-ফোঁটা ভুরু-সংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে,

পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশম-চিকন চুলে।
তাম্র থালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি',
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি
আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি
গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়া-ছবি,
শব্দটি নেই,—ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে।
ঐ তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি ;
কতদিন হোলো গিয়েছ, ভাবিব না তা',
শুধু রচি ব'সে নিমন্ত্রণের চিঠি।
মনে আসে, তুমি পুব জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে,
উৎসুক চোখে বুঝি আশা করো কারে,
আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খ'সে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।
এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে ;
পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়
চোখ টিপে' ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি',
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিনি,

আনিয়ো মধুর স্বপ্ন-সঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা,
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

(১৪ জুন, ১৯৩৫) —বীথিকা।

উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কী লাগি' ছিলে অন্য মনে
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি' এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি' গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতাপানে আঁখি অন্ধ ছিল॥

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার বরন ফল খসিয়া পড়ে;
কহিনু, "ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ,"
হায়রে তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল॥

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।
তারার আলোক সাথে মিলি' মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিঃস্পন্দ ছিল॥

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি'।
প্রহর অতীত হোলো, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল॥

কে বোঝে কাহার মন। অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।
আশা ছিল কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত,
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল॥

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি'।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল॥

(৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১) —বীথিকা

ঈষৎ দয়া

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু স্বর
আলো আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,
আশা নিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর ॥

নির্মম হোতে কুণ্ঠিত হও মনে ;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি'
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে ক্ষুধা ॥

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্গুন রাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি',
সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণ বায়ু তরে।
তার সম্পদ সারা অরণ্য ভরি',
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরী
কুঞ্জে কুঞ্জে লুণ্ঠিত ধূলি পরে ॥

উত্তর বায়ু আমি ভিক্ষুক সম
হিম-নিঃশ্বাসে জানাই মিনতি মম
শুষ্ক শাখার বীথিকারে চঞ্চলি'।

অকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে,
কৃপণ দয়ায় কচিৎ একটি ফুটে
অবগুণ্ঠিত অকাল পুষ্প-কলি ॥

যত মনে ভাবি রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
প্রলয়-প্রবাহে ঝ'রে-পড়া যত পাতা।
বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণগৌরব আনে।
বরণ-মালা হয় না তাহাতে গাঁথা ॥

(১৯৩৪, জানুয়ারী) —বীথিকা

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত করো তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ করো সুধা
বাম হাতে চূর্ণ করো পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত করো অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য করো বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে যার অধিকার।

প্রেয়কে করো দুর্মূল্য,
কৃপা করো না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পর-যুগে
মন্ত্র পড়লেন দানব-দমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হোলো অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখর-চূড়ায়,
পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।
নম্র হোলো শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।

তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠেছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনেরাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগ-দানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে,
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।
শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে-মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।
অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপকধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
"আমি আনন্দিত।"

অন্তদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদী-ডাকাতের মতো।
আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ মিলনের স্বগতপ্রলাপ
আম্রমুকুলের গন্ধে।
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে॥
স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যূষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনাবেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।
জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা
সব কীর্তির অবসান।

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হোতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় ক'রে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে-রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে॥

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

(১৬ অক্টোবর, ১৯৩৫) —পত্রপুট।

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্ত-সমুদ্রে সদ্য স্নান ক'রে।
মনে হোলো, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।

মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে

—তার নাম করব না—

সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি,

খোলা ছাদে গান গাইছে একা।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম পিছনে

ও হয়তো জানে না, কিংবা হয়তো জানে ॥

ওর গানে বল্‌ছে সিন্ধু কাফির সুরে—

—চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে

ডাকব না ফিরে ডাকব না,

ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে।—

শুনতে শুনতে স'রে গেল সংসারের ব্যাবহারিক আচ্ছাদনটা,

যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোলো

অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;

তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;

অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিঃশ্বাস,

দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।

একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র

তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—

পৃথিবীর ধূলি মধুময়।

সেই সুরে আমার মন বললে,—

সংগীতময় ধরার ধূলি।

আমার মন বল্‌লে,—

মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,

তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে

গানের পাখায় ॥

আমি ওকে দেখলেম—
যেন নিকষবরন ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,
অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদুমৃদু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে ॥

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,
আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।
আকাশে ধ্রুবতারার অনিমেষ দৃষ্টি,
বাতাসে সাহানা রাগিণীর করুণা ॥

আমি ওকে দেখলেম
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা অচেনার অস্পষ্টতায়।
সে যুগের পালানো বাণী ধরবে ব'লে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
সুরের ছোঁওয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে ॥

সমুখে ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে বাদামগাছের মাথা,
উপরে উঠল কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ।
ডাকলেম নাম ধ'রে।
তীক্ষ্ণ বেগে উঠে দাঁড়াল সে,
ভ্রূকুটি ক'রে বললে, আমার দিকে ফিরে,—
"এ কী অন্যায়
কেন এলে লুকিয়ে।"

কোনো উত্তর করলেম না।

বললেম না, প্রয়োজন ছিল না এই তুচ্ছ ছলনার

বললেম না, আজ সহজে বলতে পারতে, এসো,

বল্‌তে পার্‌তে,—খুশি হয়েছি।

মধুময়ের উপর পড়ল ধুলার আবরণ ॥

পরদিন ছিল হাটবার।

জানলায় ব'সে দেখছি চেয়ে।

রৌদ্র ধু ধু করছে পাশের সেই খোলা ছাদে।

তার স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্ত রাত্রের বিহ্বলতা

সে দিয়েছে ঘুচিয়ে।

নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠেবাটে,

মহাজনের টিনের ছাদে,

শাকশব্‌জির ঝুড়ি চুপ্‌ড়িতে,

আঁটিবাঁধা খড়ে,

হাঁড়িমালসার স্তূপে,

নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল

মহানীম গাছে ফুলের মঞ্জরীতে ॥

পথের ধারে তালের গুঁড়ি আঁকড়ে উঠেছে অশথ,

অন্ধ বৈরাগী তারি ছায়ায় গান গাইছে হাঁড়ি বাজিয়ে—

—কাল আসব ব'লে চলে গেল

আমি যে সেই কালের দিকে তাকিয়ে আছি।—

কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে

ঐ সুরের শিল্পে বুনে উঠছে

যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—

"তাকিয়ে আছি।"

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে
বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি,
গলায় বাজছে ঘণ্টা,
চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি।
আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে-দেওয়া।
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।
বেদমন্ত্রের ছন্দে
আবার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।
কেরোসিনের দোকানের সামনে
চোখে পড়ল একজন এ-কেলে বাউল।
তালিদেওয়া আলখাল্লার উপরে
কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া।
লোক জমেছে চারিদিকে।
হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এ-ও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।

ওকে ডেকে নিলেম জানলার কাছে,
ও গাইতে লাগল—
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধ'রে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে॥

(২৫ অক্টোবর, ১৯৩৫) —পত্রপুট

শেষ পহরে

ভালবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলাফেলারই স্বাদ-ভোলানো।
পথের পথিকও পারে তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারিকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরতেই।
তার বেশি আশা করিনি সেদিন।

চলে গেলে তুমি রাতের শেষ প্রহরে।
মনে ছিল বিদায় নিয়ে যাবে
শুধু ব'লে যাবে—"তবে আসি।"
যে কথা আর-একদিন বলেছিলে,
যা আর কোনোদিন শুনব না,
তার জায়গায় ঐ দুটি কথা,
ঐটুকু দরদের সরু বুননিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার।

প্রথম ঘুম যেমনি ভেঙেছে
বুক উঠেছে কেঁপে,
ভয় হয়েছে সময় বুঝি গেল পেরিয়ে।
ছুটে এলেম বিছানা ছেড়ে।
দূরে গির্জের ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।
রৈলেম বসে আমার ঘরের চৌকাঠে

দরজায় মাথা রেখে—
তোমার বেরিয়ে যাবার বারান্দার সামনে।
অতি সামান্ত একটুখানি সুযোগ
অভাগীর ভাগ্য তাও নিল ছিনিয়ে,
পড়লেম ঘুমে ঢ'লে,
তুমি যাবার কিছু আগেই।
আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
এলিয়ে-পড়া দেহটা;
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন।
বুঝি সাবধানেই গেছ চলে,
ঘুম ভাঙে পাছে।
চম্‌কে জেগে উঠেই বুঝেছি
মিছে হয়েছে জাগা।
বুঝেছি, যা যাবার তা গেছে এক নিমেষেই,
যা পড়ে থাকবার তাই রইল পড়ে
যুগযুগান্তর।

চুপচাপ চারিদিক
যেমন চুপচাপ পাখিহারা পাখির বাসা
গানহারা গাছের ডালে।
কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে
ভোরবেলাকার ফ্যাকাসে আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে আমার পাঙাশ-বরন শূন্য জীবনে।
গেলেম তোমার শোবার ঘরের দিকে
বিনা কারণে।
দরজার বাইরে জ্বলছে
ধোঁওয়ায় কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন,
বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।

ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
একটু একটু কাঁপছে বাতাসে।
জানলার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা,
আশা-বিদায়-করা
যত ঘুমহারাদের সাক্ষী।
হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভুলে
সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।
মনে হোলো, যদি সময় থাকে,
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে,
কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয়নি ব'লে।

(২৩ মে, ১৯৩৬) —শ্যামলী।

বিদায়-বরণ

চার প্রহর রাতের বৃষ্টি-ভেজা ভারি হাওয়ায়
থম্‌কে আছে সকাল বেলাটা,
রাত-জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।
বাদ্‌লার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো।
যত সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চারিদিকে
হাল্‌কা বেদনার রং মেলে দিয়ে।
তাদের ধরি-ধরি করে মনটা,
ভাবি, বেঁধে রাখি লেখায়;

পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।
এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপ্‌সা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী
ওকে একবার ডাকো ফিরে,
দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে ;
করো ওকে বিদায়-বরণ।
বলো তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুলফোটা আর ফুলঝরার ফাঁকে।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।
তাই আমার আজ মন ভেসেছে
পলাশ বনের চিকন ঢেউয়ে,
ফাটা মেঘের কিনার দিয়ে উপছে-পড়া
আচম্‌কা রোদ্দুরের ছটায়।

(৩ জুন, ১৯৩৬) —শ্যামলী।

স্বপ্নে দেখি নৌকা আমার

স্বপ্নে দেখি নৌকা আমার
নদীর ঘাটে বাঁধা ;
নদী কিংবা আকাশ সেটা
লাগল মনে ধাঁধাঁ ॥
এমন সময় হঠাৎ দেখি
দিক্-সীমানায় গেছে ঠেকি'
একটুখানি ভেসে-ওঠা
ত্রয়োদশীর চাঁদা।
"নৌকাতে তোর পার ক'রে দে"
—এই ব'লে তার কাঁদা ॥
আমি বলি "ভাবনা কী তায়,
আকাশ পারে নেব মিতায়,
কিন্তু আমি ঘুমিয়ে আছি
এই যে বিষম বাধা ;
দেখছ আমার চতুর্দিকটা
স্বপ্নজালে ফাঁদা ॥"

—খাপছাড়া।

ঝড়

দেখ্ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়,
ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ঐ করে ধড়্ফড়্।
আকাশতলে বজ্রপাণির ডঙ্কা উঠল বাজি',
শীঘ্র তরী বেয়ে চল্ রে মাঝি।
ঢেউয়ের গায়ে ঢেউগুলো সব গড়ায় ফুলে' ফুলে',
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে দুলে দুলে।

ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু করে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ভয়ে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির পরে।
হাওয়ার বিষম ধাক্কা তাদের লাগছে ক্ষণে ক্ষণে,
উঠছে পড়ছে, পাখার ঝাপট দিতেছে প্রাণপণে।
বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো,
দিক্‌দিগন্ত চম্‌কে উঠে হঠাৎ মর্মাহত।

ঐ রে, মাঝি, খেপ্‌ল গাঙের জল,
লগি দিয়ে ঠেকা নৌকো, চরের কোলে চল্‌।
সেই যেখানে জলের আশা, চখাচখীর বাস,
হেথা হোথায় পলিমাটি দিয়েছে আশ্বাস
কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা।
তলের চরে বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা।
হোথায় জেলে বাঁশ টাঙিয়ে শুকোতে দেয় জাল,
ডিঙির ছাতে বসে বসে শেলাই করে পাল।
রাত কাটাব ঐখানেতেই করব রাঁধাবাড়া,
এখনি আজ নেই তো যাবার তাড়া।
ভোর থাকতে কাক ডাক্‌তেই নৌকো দেব ছাড়ি,
ইটেখোলার মেলায় দেব সকাল সকাল পাড়ি।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪) —ছড়ার ছবি

শনির দশা

আধবুড়ো ঐ মানুষটি মোর
নয় চেনা,
একলা বসে ভাবছে, কিংবা
ভাবছে না,
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই ভাবছি,
মনে মনে আমি যে ওর মনের মধ্যে নাবছি।

বুঝিবা ওর মেঝো মেয়ে পাতা ছ'য়েক ব'কে
মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে।
উমারানীর বিষম স্নেহের শাসন,
জানিয়েছিল, চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন,
জিদ ধরেছে, হোক না যেমন-করেই
আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই।
আবেদনের পত্র একটি লিখে
পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কর্তাবাবুটিকে
বাবু বললে, হয় কখনো তা কি,
মাসকাবারের ঝুড়িঝুড়ি হিসাব লেখা বাকি,
সাহেব শুনলে আগুন হবে চ'টে,
ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে।
মেয়ের দুঃখ ভেবে
বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে।
সুবুদ্ধি তার কইল কানে রাগ গেল যেই থামি',
আসন্ন পেন্‌শনের আশা ছাড়াটা পাগলামি।

নিজেকে সে বললে, ওরে, এবার না হয় কিনিস
ছোটো ছেলের মনের মতো একটা কোনো জিনিস
যেটার কথাই ভেবে দেখে দামের কথায় শেষে
বাধায় ঠেকে এসে।
শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি ঝুমঝুমি,
দেখলে খুশি হয়তো হবে উর্মি।
কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রুপোর মতো।
এমনি করে সংশয়ে তার কেবলি মন ঠেলে,
হাঁ-না নিয়ে ভাবনাস্রোতে জোয়ার ভাঁটা খেলে।
রোজ সে দেখে টাইম টেবিলখানা,
ক'দিন থেকে ইস্টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা।
সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
গাড়িটা তার প্রত্যহ হয় ফেল্।
চিন্তিত ওর মুখের ভাবটা দেখে
এমনি একটা ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে।
কৌতূহলে শেষে
একটুখানি উসখুসিয়ে একটুখানি কেশে,
শুধাই তারে বসে তাহার কাছে,
কী ভাবতেছেন, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে।
বললে বুড়ো, কিচ্ছুই নয়, মশায়,
আসল কথা, আছি শনির দশায়,
তাই ভাবছি কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটি টাকার বাজি ফেলে দেবার।
আপনি বলুন, কিনব টিকিট আজ কি।
আমি বললেম, কাজ কী।
রাগে বুড়োর গরম হোলো মাথা,
বললে, থামো ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা,

কেনার সময় রইবে না আর
আজিকার এই দিন বই,
কিনব আমি, কিনব আমি,
যেঁ করে হোক কিনবই ॥

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪) —ছড়ার ছবি।

রিক্ত

বইছে নদী বালির মধ্যে, শূন্য বিজন মাঠ,
নাই কোনো ঠাঁই ঘাট।
অল্প জলের ধারাটি বয়, ছায়া দেয় না গাছে,
গ্রাম নেইকো কাছে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে
চোখ-ধাঁধাঁনো তাপে।
কোথাও কোনো শব্দ যে নেই তারি শব্দ বাজে
ঝাঁ ঝাঁ ক'রে সারা দুপুর দিনের বক্ষোমাঝে।
আকাশ যাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
দিগ্বধূ রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে।
দূরে দূরে কাশের ঝোপে শরতে ফুল ফোটে,
বৈশাখে ঝড় ওঠে।
আকাশ ব্যেপে ভূতের মাতন বালুর ঘূর্ণি ঘোরে,
নৌকো ছুটে আসে না তো সামাল সামাল ক'রে।

বর্ষা হোলে বন্যা নামে দূরের পাহাড় হতে
কূল হারানো স্রোতে
জলে স্থলে হয় একাকার ; দমকা হাওয়ার বেগে
সওয়ার যেন চাবুক লাগায় দৌড়-দেওয়া মেঘে।
সারা বেলাই বৃষ্টি ধারা ঝাপট লাগায় যবে
মেঘের ডাকে সুর মেশে না ধেনুর হাম্বারবে।
খেতের মধ্যে কলকলিয়ে ঘোলা স্রোতের জল
ভাসিয়ে নিয়ে আসে না তো শ্যাওলা পানার দল।
রাত্রি যখন ধ্যানে বসে তারাগুলির মাঝে
তীরে তীরে প্রদীপ জ্বলে না যে,
সমস্ত নিঃঝুম
জাগাও নেই কোনোখানে কোথাও নেই ঘুম॥

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪) —ছড়ার ছবি।

যেদনি চৈতন্য মোর মুক্তি পেল

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,

কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণ-বিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এদিকে দানব-পক্ষী ক্ষুব্ধশূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল র'বে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে॥

(২৫।১২।৩৭) —প্রান্তিক।

নাগিনীরা চারিদিকে

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে ॥

(২৫।১২।৩৭) —প্রান্তিক।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী (বৈরাগ্য)	…	১৭৩
কালি মধু-যামিনীতে (রাত্রে ও প্রভাতে)	…	১৬৬
কালের যাত্রার ধ্বনি (বিদায়)	…	৪২৬
কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে (অনাবশ্যক)	…	৩০৫
কিনু গোয়ালার গলি (বাঁশি)	…	৪৩৫
কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে (কুঁড়ি)	…	২৭০
কৃষ্ণকলি আমি তারেই (কৃষ্ণকলি)		২৫২
কেন তবে কেড়ে নিলে (ব্যক্ত প্রেম)	…	৩৯
কে নিবি গো কিনে আমায় (আত্মবিক্রয়)	…	৩১৫
কেরোসিন শিখা বলে (কুটুম্বিতা)	…	২৫৮
কে লইবে মোর কার্য (কর্তব্য গ্রহণ)	…	২৬০
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় (কো তুঁহুঁ)	…	৩
কোথা রাত্রি কোথা দিন (চিরদিন)	…	১৮
কোন দূর শতাব্দের (শিবাজি-উৎসব)	…	৪০৩
কোন হাটে তুই (যথাস্থান)	…	২৩৮
ক্ষান্ত হও ধীরে কও কথা (সন্ধ্যা)	…	১১৬
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে (পরশ-পাথর)	…	৬৫

খ

খাঁচার পাখি ছিল (দুই পাখি)	..	৭১
খোকা মাকে শুধায় ডেকে (জন্মকথা)	…	২৮৯
খোলো খোলো হে আকাশ (ক্ষণিকা)	…	৩৯৩

গ

গগনে গরজে মেঘ (সোনার তরী)	…	৫৭
গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা (দেবতার গ্রাস)	…	২২২

ঘ

ঘন অশ্রু-বাষ্পে ভরা (সাবিত্রী)	…	৩৮৫

চ

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে (ঈষৎ দয়া)		৪৬৭
চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি (প্রভাতী)		৩৯৯
চার প্রহর রাতের বৃষ্টি-ভেজা ভারি হাওয়ায় (বিদায়-বরণ)		৪৭৯
চিত্তকোণে ছন্দে তব বাণীরূপে (মায়া)	…	৪১২
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির (প্রার্থনা)	…	২৬৫
চিরকাল এ কী লীলা গো (মরণ-দোলা)	…	২৭৯

বিষয় পৃষ্ঠা